চলে যায় বসন্তের দিন

হুমায়ূন আহমেদ

। হিমু সমগ্র ।

BENGALIEBOOK.COM
BE
বেঙ্গলিইবুক.কম
bengaliebook.com
★2022★

সূচিপত্র

১. মাজেদা খালার চিঠি 2

২. রাতে কাউকে কিছু না বলে 29

৩. জহির বসে আছে 51

৪. ওপাশ থেকে যে টেলিফোন ধরেছে 78

৫. মন বিষণ্ণ কেন 103

৬. বিখ্যাত ওস্তাদ 123

৭. হিমু ভাইজান 136

৮. হ্যান্ডস আপ 139

৯. ভালো থাকুক সমগ্র মানব জাতি 153

১. মাজেদা খালার চিঠি

[“চলে যায় বসন্তের দিন!”

কী অদ্ভুত কথা! বসন্তের দিন কেন চলে যাবে? কোনো কিছুই তো চলে যায় না। এক বসন্ত যায়, আরেক বসন্ত আসে। স্বপ্ন চলে যায়, আবারো ফিরে আসে।
আমি হিমু!
আমি কেন বলব— চলে যায় বসন্তের দিন। আমার মধ্যে কি কোনো সমস্যা হয়েছে? কী সেই সমস্যা?]

প্রসঙ্গ : হিমু।

অহঙ্কার প্রকাশ পায় এমন কিছু লেখার ব্যাপারে। আমি বেশ সচেতন। খুব চেষ্টা করি কেউ যেন আমার ভেতরের অহঙ্কার বুঝতে না পারে। এই যুক্তিতে, যে-ঘটনাটি আমি এখন বলব তা বলা উচিত না। ঘটনাটির মধ্যে সূক্ষ্ম এবং স্কুল— দুই রীতিতেই অহঙ্কার প্রকাশ পায়। তবু বলে ফেলছি।
দুবছর আগে আমি কোলকাতা বইমেলায় গিয়েছিলাম। বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে মাত্র ঢুকেছি, হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ছেলে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, দাদা, আমি হিমু। দেখুন। আমার পাঞ্জাবি–হলুদ। আমি বললাম, হিমুরা তো খালি পায়ে হাঁটাহাটি করে। দেখি তোমার পা। সে সবগুলি দাঁত বের করে তার খালি পা দেখাল।

নিজের দেশে অনেক হিমুর দেখা পেয়েছি। বিদেশে এই প্রথম খাঁটি হিমু দেখলাম। আমার ত্রিশ বছর লেখালেখির ফসল যদি হয় কিছু হিমু তৈরি করা— তাহলে তাই সই। আমি এতেই খুশি। পরম করুণাময় আমাকে যথেষ্টই করুণা করেছেন।

হুমায়ুন আহমেদ

নুহাশপল্লী, গাজীপুর

১০.০১.২০০২

———————

০১.

হিমু,

আমি মহাবিপদে পড়েছি। তুই আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর। বিনিময়ে যা চাইবি তাই দেব। আমার অতি গুণধর পুত্র মনে হয়। কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে। ভাড়া খাটা টাইপ একটা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছে। মুখে অবশ্যি এখনো কিছু বলছে না। আমি গন্ধে গন্ধে বুঝে ফেলেছি। আমার ঘুম হারাম হয়ে গেছে। মেয়েটার নাম ফুলফুলিয়া। যে মেয়ের নাম ফুলফুলিয়া সে কেমন মেয়ে বুঝতেই তো পারছিস। ঘটনা এখানেই শেষ না। ঐ হারামজাদি মেয়ের বাবা কী করে জিনিস? সে হারমোনিয়াম বাদক। যাত্রাদলে হারমোনিয়াম আরো কী সব নাকি বাজায়। তুই চিন্তা করে দেখ ছেলের বাবা কেবিনেট সেক্রেটারি। আর শ্বশুর হারমোনিয়াম বাদক। হিমু যেভাবেই হোক জহিরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে পথে আনতে হবে। ঐ হারামজাদিকে দূরে কোথাও বিয়ে দিয়ে বিদায় করার ব্যবস্থা কর। যাবতীয় খরচ আমি দেব। প্রয়োজনে হারামজাদিকে গয়নাও কিনে দেব।

তোর দোহাই লাগে ঘটনা কাউকে বলবি না। চিঠি পাওয়া মাত্র আমার কাছে চলে আসবি। দুজনে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেব। তোর খালু সাহেব এখনো কিছু জানে না। তাকে ইচ্ছা করে কিছু জানাই নি। এতবড় শক সে নিতে পারবে না। ধুম করে এটাক ফেটাক হয়ে যাবে। একবার এটাক হয়েছে। দ্বিতীয়বার হলে আর দেখতে হবে না। হিমু, তুই আমাকে বাঁচা।

ইতি
তোর মাজেদা খালা

এক পৃষ্ঠার চিঠি। চিঠির সঙ্গে পাঁচশ টাকার চকচকে একটা নোট স্ট্রেপল করা। এটা হলো মাজেদা খালার সন্টাইল। তিনি কাউকে চিঠি দিয়েছেন সঙ্গে টাকা স্ট্রেপল করা নেই এমন কখনো হয় নি। চিঠির সঙ্গে টাকা দেয়ার পেছনে একটা গল্প আছে। খুব ছোটবেলায় মাজেদা খালার বড় মামা তাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠির সঙ্গে ছিল একটা চকচকে দশ টাকার নোট। জীবনের প্রথম চিঠি, সেই সঙ্গে টাকা। খালার মাথার ভেতরে ব্যাপারটা ঢুকে গেল। তখন থেকেই তিনি ঠিক করেছেন–যখনই কাউকে চিঠি লিখবেন সঙ্গে টাকা থাকবে। শৈশবের প্রতিজ্ঞা কৈশোর পর্যন্ত গড়ায় না। মাজেদা খালা ব্যতিক্রম। তিনি এখনো প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলেছেন। শুরুতে দশ টাকা, বিশটাকা দিতেন। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে টাকার পরিমাণ বেড়েছে। এখন চিঠি প্রতি পাঁচশ টাকা।

মাজেদা খালার চিঠিকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয়ার কোনো কারণ নেই। দড়ি দেখলেই যারা সাপ মনে করে তিনি তাদের চেয়েও দুই ডিগ্রি ওপরে— যেকোনো লম্বা সাইজের জিনিস

দেখলেই তিনি সাপ মনে করেন। কাছে গিয়ে দেখবেনও না–সাপ কি-না। দূর থেকেই চিৎকার চেঁচামেচি–ওমাগো, দোতলায় সাপ এলো কীভাবে?

আমি নিশ্চিত জহিরকে নিয়ে তিনি যে মহাদুশ্চিন্তায় পড়েছেন তা পুরোপুরি অর্থহীন। জহির অতি ভালো ছেলে। সে যে কত ভালো তা একটা অতি ব্যবহার করে বুঝানো যাবে না। খুব কম করে হলেও তিনটা অতি ব্যবহার করতে হবে–অতি অতি অতি ভালো ছেলে। সে ফিজিক্সে অনার্স পড়ছে। দুর্দান্ত ছাত্র। পাশ করেই ঢাকা ইউনির্ভাসিটিতে লেকচারারের চাকরি পেয়ে যাবে। কিন্তু তার জীবনের স্বপ্ন সে একটা কফির দোকান দেবে। আধুনিক কফিশপ। জীবন কাটাবে কফি বিক্রি করে। কারণ কফির গন্ধ তার ভালো লাগে। কফি হাউসে লোকজন আনন্দ করে কফি খেতে খেতে গল্প করে–এই দৃশ্য দেখতে ভালো লাগে এবং তার নিজেরও কফি খেতে ভালো লাগে। সে কফি হাউসের নামও ঠিক করে রেখেছে— শুধুই কফিতা।

জহিরের ধারণা ফ এবং ব খুব কাছাকাছি। শুধুই কফিতা আসলে শুধুই কবিতা। নিতান্তই ভালোমানুষ টাইপ লোকজনের মাথাতেই এ রকম আইডিয়া আসে। জহির সরল ধরনের ভালোমানুষ। পৃথিবীতে বক্র ধরনের ভালোমানুষও আছে। বক্র ভালোমানুষরা ভালো। তবে তাদের চিন্তা-ভাবনা বক্র। জহির সেরকম না। ফুলফুলিয়া হয়েছে। একজন ভালো মানুষ অন্য একজন ভালোমানুষকে খুঁজে বের করে। একটা চোর খুঁজে বের করে আরেকটা চোরকে। ফুলফুলিয়ার সঙ্গে পরিচয় হলে দেখা যাবে সেও চমৎকার একটি মেয়ে। জহিরের শুধুই কফিতা কফিশপে কফি বানানোর জন্যে ছটফট করছে।

কাস্টমারকে নিজেই ছুটে গিয়ে কফি দিচ্ছে। আদুরে গলায় বলছে— কফি কেমন হয়েছে খেয়ে বলুন তো? ভালো হলে কিন্তু আরেক মগ খেতে হবে।

মাজেদা খালার দুশ্চিন্তা দূর করার জন্যে না, ফুলফুলিয়ার ব্যাপারে কৌতূহলী হয়েই খালার ধানমণ্ডির বাসায় গেলাম। খালু সাহেব আমাকে দেখে প্রথম কিছুক্ষণ এমনভাবে তাকিয়ে থাকলেন যেন চিনতে পারছেন না। তারপর শুকনো গলায় বললেন, কী ব্যাপার?

আমি বললাম, কোনো ব্যাপার না, আপনাদের দেখতে এসেছি।

খালু সাহেব ও বলে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ম্যাগাজিনে মুখ ঢেকে ফেললেন। খালু সাহেব আমাকে সহ্যই করতে পারেন না। মাজেদা খালা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, তোর খালুর সামনে ঐ প্রসঙ্গ তুলবি না।

আমি বললাম, Ok.

খালা বললেন, জহিরের কাছ থেকে কায়দা করে ব্যাপারটা আগে জেনে নে। আমি যে ঘটনা জানি এটা যেন জহির টের না পায়।

আমি আবারো বললাম, Ok.

খালা বিরক্ত গলায় বললেন, Ok ok করিস না তো। তোকে দেখে মনে হচ্ছে তুই ব্যাপারটা হাসি তামাশা হিসেবে নিচ্ছিস। মোটেই হাসি তামাশা না।

অবশ্যই হাসি তামাশা না। জহির কোথায়? এক্ষুণি সাঁড়াশি দিয়ে জহিরের পেট থেকে সব কথা বের করে ফেলব। শুরু হবে সাঁড়াশি আক্রমণ।

খালা বললেন, আজ রাতে তুই আমার বাড়িতে থাকিবি।

আমি বললাম, কথা বের করে তোমাকে দিয়ে যাই। থাকার দরকার কী?

থাকলে সমস্যা কী?

বড়লোকের বাড়িতে আমার ঘুম হয় না খালা।

কমুনিস্টদের মতো কথা বলবি না। তুই কমুনিষ্ট না। তুই হিমু। তোকে যেখানে ঘুমুতে বলা হবে তুই সেখানেই ঘুমাবি। রাতে কী খাবি?

যা খাওয়াবে তাই খাব ।

নতুন একটা বাবুর্চি রেখেছি, খুব ভালো মোগলাই রাধে। তোর কপাল খারাপ বাবুর্চি ছুটিতে আছে। অসুবিধা নেই পোলাও খা। পোলাও আর ঝাল মুরগির ঝোল, হবে না।? ফ্রিজে ইলিশ মাছ আছে, ইলিশ মাছ ভেজে দিতে বলব।

আচ্ছা।

গ্রামের বাড়ি থেকে সরবাটা ঘি এনেছি। খেয়ে দেখ ঘি কাকে বলে।

ঠিক আছে, খাব সরবাটা ঘি।

মাজেদা খালা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ঘর ভরতি খাবার। কেউ খায় না।

খায় না কেন?

তোর খালুর ডিসপেপসিয়া হয়েছে— কিছুই হজম হয় না। পানি খেলেও নাকি টক ঢেকুর উঠে। আর জহিরও খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। গত এক মাস ধরে শুধু ডাল ভাত খাচ্ছে। ঐ দিন বলল শুকনা মরিচ। আর রসুন পিষে ভর্তা বানিয়ে দিলে ভর্তা দিয়ে খাবে। আর কিছু খাবে না।

বলো কী?

খালা হতাশ গলায় বললেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ফুলফুলিয়া মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় হবার পর জহির এই পাখনা করছে। ঐ মেয়ে যেহেতু শুকনা মরিচের ভর্তা দিয়ে ভাত খাচ্ছে, এর বেশি কিছু খাবার মুরাদ নাই কাজেই জহিরকেও তাই খেতে হবে।

তাহলে তো ঘটনা অনেক দূর গড়িয়েছে। তুমি চিন্তা করো না। আমি টেককেয়ার করছি। হয় জহিরের স্ত্রু টাইট দিয়ে দেব আর নয়তো নাট খুলে স্ক্রু বের করে নিয়ে আসব।

তুই একটা কাজ করবি?

অবশ্যই করব। কাজ করে ভাত খাব। ফুড ফর ওয়ার্ক।

একটা ডিজিটাল রেকর্ডার পকেটে করে নিয়ে যা। জহিরের সঙ্গে কথাবার্তা যা হবে। রেকর্ড করে ফেলবি।

মা হয়ে ছেলের গোপন কথা রেকর্ড করা ঠিক হবে?

অবশ্যই ঠিক হবে। মা ছেলের ভবিষ্যৎ দেখবে না? সে মাতারির সঙ্গে প্রেম করবে। আমি আটকাব না?

তাহলে দাও তোমার ডিজিটাল রেকর্ডার।

আসল কথা যখন শুরু হবে তখন কায়দা করে রেড বাটন পুশ করবি। পনেরো মিনিট রেকর্ড হবে।

আমি গলা নামিয়ে বললাম, নিজেকে কেমন যেন স্পাই স্পাই লাগছে। খালু সাহেবের তো একটা লাইসেন্স করা পিস্তল আছে। পিস্তলটিও দাও। পকেটে করে নিয়ে যাই। স্পাই যখন হয়েছি পুরোপুরি হই। একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দাও। স্পাইদের সঙ্গে ম্যাগনিফাইং গ্রাস থাকে।

ফাজলামি করিস না হিমু। তোকে ফাজলামি করার জন্যে ডাকি নি। তোর সব ভালো ফাজলামিটা ভালো না। তুই তোর খালুর সঙ্গে গল্প কর, আমি ডিজিটাল রেকর্ডারটা রেডি করে দেই। ব্যাটারি। আনতে হবে। ব্যাটারি নেই।

আমি খালু সাহেবের (রহমতউল্লাহ তালুকদার) সামনে বসে আছি। কতক্ষণ বসে থাকতে হবে বুঝতে পারছি না। ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডারের ন্যাশনাল জিওগ্রাফি থেকে চোখ তুলছেন না। তিনি হাটুর উপর পা তুলে দিয়েছেন। পায়ের পাতা নাড়ছেন। পাশে বসে থাকা মানুষকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করার চেষ্টা। চেষ্টা সফল হচ্ছে না। আমি বরং তার কর্মকাণ্ডে মজা পাচ্ছি। আমি তাকিয়ে আছি টিভির দিকে। টিভিতে সিএনএন চলছে। শব্দহীন টিভি। খালু সাহেব ইদানীং শব্দহীন টিভি দেখেন।

হিমু।

জ্বি।

খালু সাহেব ন্যাশনাল জিওগ্রাফি বন্ধ করে আমার দিকে তাকালেন। তার ভুরু কুঁচকে আছে। নাকিও খানিকটা কুঞ্চিত। গরম মাড়ে ছাল পুড়ে ঘা হয়ে যাওয়া নেড়ি কুত্তার দিকে মানুষ এইভাবেই তাকায়।

কী করছি আজকাল?

কিছু করছি না।

কিছু করছি না বাক্যটা যেভাবে বললে তাতে মনে হচ্ছে কিছু না করাটা খুব মহৎ কিছু।

খারাপ কিছু করার চেয়ে কিছু না করা তো অবশ্যই মহৎ। চুরি-ডাকাতি তো ...

আমার সঙ্গে বাজে তর্ক করবে না।

জ্বি আচ্ছা।

ব্যক্তিগতভাবে তোমার প্রতি আমার কোনোই বিদ্বেষ নেই। কিন্তু আমি অকর্মণ্য অলস মানুষ সারাজীবন অপছন্দ করেছি, আমৃত্যু করব বলে ধারণা। তুমি যদি কিছু মনে না কর, অন্য কোথাও গিয়ে বস। তুমি আমার পাশে বসে আছ বলেই পড়ায় মন দিতে পারছি না। কিছু মনে করছ না তো?

জ্বি না কিছু মনে করছি না।

আমি নিশ্চিত তুমি আমার কথায় হার্ট হয়েছ। তোমাকে হার্ট করার জন্যে কথাগুলি বলি নি। আমার নিজের ছেলে জহির যদি তোমার মতো জীবন যাপন করত। তাকেও আমি আমার পাশে বসতে দিতাম না।

খালু সাহেব। আবারো ম্যাগাজিন পাঠে মন দিলেন। এই পরিস্থিতিতে নিঃশব্দে উঠে অন্য কোথাও সরে যাওয়া উচিত। সেটি করছি না। মানুষটাকে আরেকটু রাগিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে। রেগে তিনি তেতে থাকবেন, কিন্তু ভদ্রতা ও রুচিবোধের কারণে আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে নিচু গলায় প্রায় হাসিমুখে— এই দৃশ্যটি দেখতে ভালো লাগে। আদ্রতা এবং রুচিবোধ থাকারও বিপদ আছে।

আমি এখন জহিরের ঘরে। জহির হাত-পা সোজা করে বিছানায় লম্বা হয়ে হয়ে ঘুমুচ্ছে। গাঢ় ঘুম। এক বছর পর জহিরের সঙ্গে দেখা। মানুষের বয়স বাড়ে, এই ছেলের মনে হয়। বয়স কমছে। চেহারায় বালক বালক ভাব এসে গেছে। ঘুমন্ত জহিরকে দেখে মনে হচ্ছে

তার স্কুলে ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। সে রাত জেগে পড়ছে। মাঝখানে ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ শুয়েছিল, ভেবে রেখেছিল রেস্ট নিয়ে আবার পড়া শুরু করবে। রেস্ট নিতে নিতে ঘুম এসে গেছে। আমি ডাকলাম, এই জহির! এই!

জহির স্প্রিং-এর পুতুলের মতো উঠে বসল। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে রোবট টাইপ গলায় বলল, হিমু ভাইজান কটা বাজে?

আমি বললাম, সাড়ে আট।

জহির বলল, তোমার নটার মধ্যে আসার কথা। তুমি সাড়ে আটটায় চলে এসেছি। আশ্চর্য তো!

আমার নটার মধ্যে আসার কথা না-কি?

হুঁ। আমি তোমাকে কল দিয়েছি। সাতটা পাঁচ মিনিটে। তখনই বলে দিয়েছি বাই নাইন তুমি যেন চলে আস। মানুষ টাইমের পরে আসে, তুমি চলে এসেছ আগে।

কীভাবে কাল দিলি?

আধ্যাত্মিক উপায়ে কল দিয়েছি। ব্যাপারটা যে সত্যি সত্যি কাজ করবে বুঝতে পারি নি। আমার খুবই অবাক লাগছে।

মনে মনে আমাকে ডেকেছিস?

হুঁ। কীভাবে ডেকেছি শোন। প্রথমে দরজা জানালা বন্ধ করেছি। তারপর বিছানায় শবাসন করে শুয়েছি। হাত-পা সোজা করে সরলরেখার মতো শোয়া। চোখ বন্ধ করে। একমনে বলেছি–হিমু ভাইজান, তুমি যেখানেই থোক রাত নটার মধ্যে চলে আস। পঞ্চাশবারের মতো বলেছি। বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমিয়ে পড়ার কথা না। আমার ঘুম এসে গেছে। টেলিপ্যাথিক উপায়ে তোমার কাছে ম্যাসেজ চলে গেছে। তুমি চলে এসেছ। How Wonderful.

টেলিপ্যাথিক ডাকাডাকির বুদ্ধি কি তোর মাথাতেই এসেছে না কেউ দিয়েছে?

জহির গলা নিচু করে বলল, একটা মেয়ের কাছ থেকে এই বুদ্ধি পেয়েছি। এই মেয়েটার বাসায় টেলিফোন নেই। ওর যখন কাউকে ডাকার দরকার পড়ে তখন এভাবে ডাকে। তাতে নাকি কাজ হয়। মেয়েটার কথা আগে বিশ্বাস করি নি। এখন পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছে।

আমি বললাম, মেয়েটার নাম কি ফুলফুলিয়া?

বেশ কিছুক্ষণ। হতভম্ব হয়ে থাকার পর জহির প্রায় তোতলাতে তোতলাতে বলল, তুমি কীভাবে জানো?

সেটা দিয়ে তোর দরকার নেই। মেয়েটার নাম ফুলফুলিয়া কিনা বল?

হু! মেয়েটার বাবা তাকে ডাকেন ফুল। মা যখন বেঁচে ছিলেন তখন ডাকতেন ফুলিয়া। মেয়েটা করেছে কী দুজনের নাম একত্র করে তার নাম দিয়েছে ফুলফুলিয়া।

তুই আমাকে ট্যালিপ্যাথিক পদ্ধতিতে ডেকে এনেছিস কেন? ফুলফুলিয়ার বিষয়ে কথা বলার জন্যে?

হু! তুমি এতসব জানো কীভাবে? ভাইজান তুমি খুবই বিস্ময়কর একজন মানুষ।

তুই নিজেও কম বিস্ময়কর না। যা হোক এখন ঘটনা। কী বল?

তোমাকে আর নতুন করে কী বলব। তুমি তো মনে হচ্ছে সবই জানো।

তা জানি, তবু তোর মুখ থেকে শুনি...

জহির চাপা গলায় প্রায় তোতলাতে তোতলাতে বলল–ভাইজান আমি ঠিক করেছি। ফুলফুলিয়াকে বিয়ে করব।

ঠিক করে থাকলে করবি।

মা মনে হয় রাগ করবে। তাই না?

রাগ অবশ্যই করবে। তোর বাবার পিস্তল দিয়ে ফুলফুলিয়াকে গুলি করার সমূহ সম্ভাবনা।

ওকে কেন গুলি করবে? গুলি করলে আমাকে করবে।

মাজেদা খালা তোকে কিছুই বলবে না। তুই যদি একটা খুন করে এসে বলিস–মা আমি খুন করে এসেছি। তাহলে খালা বলবেন, ভালো করেছিস। এখন যা গোসল করে আয়– ভাত খা। ইলিশ মাছের ডিম রান্না করেছি।

জহির অবাক হয়ে বলল, এত কিছু থাকতে ইলিশ মাছের ডিমের কথা বললে কেন?

মনে এসেছে বলেছি। তুই এত অবাক হয়ে তাকিয়ে আছিস কেন?

মাছের ডিম খুবই অপছন্দের খাবার। ফুলফুলিয়ার আরেকটা পছন্দের খাবারের কথা শুনলে তুমি চমকে উঠবে।

শুকনা মরিচের সঙ্গে রসুন মিশিয়ে বেটে ভর্তা।

জহিরের মুখ হা হয়ে গেল। সত্যিকার বিস্মিত মানুষের মুখ দেখা খুবই আনন্দের ব্যপার। বেশির ভাগ মানুষই বিস্মিত হবার ভান করে, বিস্মিত হয় না। জহির সত্যি সত্যি বিস্মিত। তার হা করে থাকা মুখের দিকে তাকিয়ে আমি খুবই মজা পাচ্ছি।

জহির!

জ্বি ভাইজান?

ফুলফুলিয়া সম্পর্কে তোর পরিকল্পনা কী বল শুনি। খুব গুছিয়ে বলবি। তার আ.ে এক মিনিটের জন্যে চোখ বন্ধ করা।

কেন?

আমি একটা লাল বোতাম টিপব।

কীসের লাল বোতাম?

কীসের লাল বোতাম তোর জানার দরকার নেই। তোকে চোখ বন্ধ করতে বলছি তুই চোখ বন্ধ করা।

জহির বাধ্য ছেলের মতো চোখ বন্ধ করল। আমি ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডারের বোতাম টিপে জহিরের সামনে রাখলাম।

এখন ইচ্ছা করলে চোখ মেলতে পারিস। লাজ করলে চোখ মেলার দরকার নেই। ফুলফুলিয়া সম্পর্কে তোর পরিকল্পনা গড়বড় করে বলে যা। ফিসফিস করবি না। উঁচু গলায় বলবি। প্রতিটি শব্দ যেন আলাদা করে বোঝা যায়। টু দ্য পয়েন্ট থাকিবি। ফেনাবি না। রেডি, গেট সেট গো...।

জহির আবার তার বিখ্যাত রোবট গলায় কথা বলা শুরু করল। মনে হচ্ছে প্রতিমন্ত্রীদের মতো লিখিত ভাষণ পড়ছে। ভাইজান, আমি ঠিক করেছি। ফুলফুলিয়াকে বিয়ে করব। আমি জানি সবাই খুব রাগ করবে। কিন্তু আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। বিয়ে করব কাজির অফিসে। বিয়েতে তুমি একজন সাক্ষী হবে। আরেকজন সাক্ষীও তুমি জোগাড় করবে। কোত্থেকে করবে। সেটা তুমি জানো। ফুলফুলিয়া সম্পর্কে এই আমার পরিকল্পনা।

বিয়ের পরেও কি তুই তোর মাকে জানাবি না?

বিয়ের পর জানাব। কাজি অফিস থেকে টেলিফোন করে জানাব।

খালা তোকে স্ট্রেট বাড়ি থেকে বের করে দেবে। তুই যাবি কোথায়?

সেটা নিয়ে চিন্তা করি নি।

চিন্তা না করে ভালোই করেছিস। বেশি চিন্তা-ভাবনা করে কিছু হয় না। তুই একভাবে চিন্তা করে রাখবি ঘটনা ঘটবে অন্যভাবে। চিন্তাহীন জীবনযাপন করা উচিত।

ফুলফুলিয়ার একটা ছবি আমার কাছে আছে, দেখবে?

না।

ক্লাস সেভেনে পড়ার সময়কার ছবি। এখনকার চেহারার সাথে কোনো মিল নেই।

এই সময়ের কোনো ছেলে প্রেমিকার ছবি পকেটে নিয়ে ঘুরে না। ছবি পকেটে নিয়ে ঘুরাটাকে গ্রাম্যতা মনে করা হয়। তুই কী মনে করে ঘুরছিস?

আমি ছবি পকেটে নিয়ে ঘুরছি না তো। ছবিটা পেজ মার্ক হিসেবে ব্যবহার করছি। আমার অবশ্য অন্য একটা পরিকল্পনাও আছে। খুবই হাস্যকর পরিকল্পনা। বলব?

বল।

আমার কম্পিউটারে ফটোশপ আছে। আমি করব কী ফুলফুলিয়ার ছবি ফটোশপে ঢুকাব। আইনস্টাইনের ছবি তার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে প্রিন্ট বের করব। ছবিতে দেখা যাবে আইনস্টাইন ফুলির মাথায় হাত রেখে হাসি হাসি মুখে বসে আছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছবি থাকবে না? কবিগুরুর কোলে ফুলফুলিয়া বসে আছে? কবিগুরুর দাড়ির খোঁচা লাগছে ফুলফুলিয়ার গালে।

অবশ্যই থাকবে। কবি নজরুলের সঙ্গে থাকবে। কবি নজরুল হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন—ফুলফুলিয়া গান করছে।।

বাংলাদেশের বিখ্যাতদের কেউ থাকবে না? বাংলাদেশের বিখ্যাতরাও থাকবে, তবে কোনো পলিটিক্যাল ফিগার রাখব না। শেখ হাসিনা, বেগম খালেদা জিয়া এরা বাদ। শুধু কবি-সাহিত্যিকরা থাকবেন। আমার আসল ইচ্ছা ফুলিকে চমকে দেয়া। সমস্যা হচ্ছে মেয়েটা চমকায় না। ভাইজান, তুমি ওকে চমকাবার কিছু বুদ্ধি বের কর তো।

তুই কোনো চিন্তা করিস না। চমক কত প্রকার ও কী কী এই মেয়ে এখন টের পাবে। ওকে আমরা ধারাবাহিক চমকের মধ্যে রাখব। চমকাতে চমকাতে ওর চমকা রোগ হয়ে যাবে। তখন দেখবি কারণ ছাড়াই চমকাচ্ছে।

থ্যাংক য়্যু।

তুই চুপ করে বসে থাক। আমি খালাকে একটা জিনিস হ্যান্ডওভার করে এক্ষুণি আসছি।

তুমি কি রাতে থাকবে?

বুঝতে পারছি না। থেকে যেতেও পারি।

যদি রাতে থাক তাহলে ফুলির সঙ্গে পরিচয়টা কীভাবে হলো সেটা তোমাকে বলব। খুবই ইন্টারেস্টিং। শুনলে হাসতে হাসতে তোমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। আমার যখনই মনে হয়। আমি একা একা হাসি।

জহির মুখ টিপে হাসছে। কী সুন্দর সহজ হাসি! তার আনন্দ সারা শরীর দিয়ে আলোর মতো ঠিকরে বের হচ্ছে। ঠিক তখন একটা ঘটনা ঘটল। টিভির ওপর রাখা জাপানি চিনামাটির বালিকা মূর্তি ধূম করে নিচে পড়ে ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। দেয়ালে ঝুলানো দুটা ক্যালেন্ডার হঠাৎ পেণ্ডুলাম হয়ে দুলতে শুরু করল। আমরা যে খাটে বসেছিলাম। কেউ মনে হয়। সেই খাট ধরে হাচক টানে ইঞ্চি খানেক সরিয়ে দিল। মাথার ভেতরের মগজও মনে হয় খানিকটা দুলল। জহির ভীত গলায় বলল, ভাইজান কী হচ্ছে?

আমি বললাম, তেমন কিছু না। টাইট হয়ে বসে থাক। ভূমিকম্প হচ্ছে।

জহিরের মুখ দ্বিতীয়বারের মতো হা হয়ে গেল। মুখের হা বন্ধ না করেই সে কথা বলল, ভূমিকম্প হচ্ছে মানে কী?

আমি হালকা গলায় বললাম, মা বসুন্ধরা সামান্য কেঁপে উঠেছেন। ঢাকা শহর দুলছে।

আমরা বসে আছি কেন?

আমরা বসে আছি কারণ আমরা বসে বসে গল্প করছিলাম। যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতাম তাহলে— বসে না থেকে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

ততক্ষণে মাজেদা খালার বাড়িতে ভূতের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। মাজেদা খালা চিৎকার করছেন। তার কাজের তিনটি মেয়ের দুটি চিৎকার করছে। একটি গলা ছেড়ে কাঁদছে। খালু সাহেব ইংরেজিতে সবাইকে ধমকাচ্ছেন। (দারুণ টেনশনের মুহূর্তে খালু সাহেব বাংলা ভুলে যান।) মাজেদা খালা এন্ড ফ্যামিলি আটকা পড়ে গেছে। বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না। কারণ দরজা খোলার চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। মাজেদা খালা সম্প্রতি তাঁর পুরো বাড়ির দরজা তালা বদলে আমেরিকান তালা লাগিয়েছেন। এই তালাগুলো বাইরে থেকে লাগানো যায় আবার ভেতর থেকেও লাগান যায়।

জহির বলল, ভাইজান বাড়িঘর ভেঙে মাথার উপর পড়বে না?

আমি বললাম, পড়তে পারে।

আমাদের তো রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ানো উচিত। রাস্তায় যাবি কীভাবে? দরজা খোলার চাবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ভূমিকম্প থেমে গেছে তাই না ভাইজান?

প্রথম ধাক্কাটা গেছে। আসলটা বাকি আছে।

আসলটা বাকি আছে মানে? ভূমিকম্পের নিয়ম হচ্ছে প্রথম একটা ছোট ধাক্কা দেয়। সবাইকে জানিয়ে দেয় যে সে আসছে। তারপর দেয় বড় ধাক্কাটা।

বড় ধাক্কাটা কখন দেবে?

তার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। পাঁচ মিনিট পরে দিতে পারে, পাঁচ ঘণ্টা পরে দিতে পারে। আবার ধর পাঁচ দিন পরেও দিতে পারে।

ভাইজান আমার খুবই টেনশন লাগছে।

ফুলফুলিয়ার সঙ্গে কীভাবে পরিচয় হলো সেই গল্পটা শুরু করা। টেনশন কমবে। দরজায় ধরাম করে শব্দ হলো। মাজেদা খালা ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন। কন্দো কন্দাে গলায় বললেন, ভূমিকম্প হচ্ছে তোরা জনিস না?

আমি বললাম, জানি।

জেনেশুনে চুপচাপ বসে আছিস কীভাবে? রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবি না?

রাস্তায় যাব কীভাবে? তুমি তো চাবিই খুঁজে পাচ্ছ না।

এতক্ষণ খালা কাঁদোকাঁদো ছিলেন। এইবার কেঁদে ফেললেন। ফোপাতে ফোঁপাতে বললেন– চাবিটা আমি নিজের হাতে ড্রেসিংটেবিলের ফাস্ট ড্রয়ারে রাখি। আজও রেখেছি, আমার পরিষ্কার মনে আছে। ড্রেসিংটেবিলের সব ড্রয়ার খুঁজেছি। চাবি নেই।

আমি বললাম, তোমার শোবার ঘরের বালিশের নিচে দেখ তো।

খালা রাগী গলায় বললেন, বালিশের নিচে চাবি রাখি নি বালিশের নিচে কেন দেখব।

খোঁজাখুঁজির মধ্যে থাকলে তোমার টেনশনটা কমবে এইজন্যে দেখতে বলছি। কোনো একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাক। ভালো কথা, ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডারটার কাজ শেষ। তোমার কাছে কি হ্যান্ডওভার করব? পনেরো মিনিটের মতো রেকর্ড হয়েছে।

খালা যেভাবে ঝড়ের মতো এসেছিলেন ঠিক সেইভাবে ঝড়ের মতো বের হয়ে গেলেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চাবি পাওয়া গেছে, চাবি পাওয়া গেছে শব্দ শোনা গেল। দরজা খোলার শব্দ হলো। সিড়ি দিয়ে ধুপধ্যাপ শব্দে নামার শব্দ পাওয়া গেল এবং আমাকে চমকে দিয়ে জহির বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে বন্দুকের গুলির মতো দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধারণী দ্বিতীয়বার কেঁপে উঠল। ততক্ষণে ঢাকা শহর জেগে গেছে। চারদিকে হৈচৈ চিৎকার শুরু হয়েছে। রাস্তা ভর্তি মানুষ। এর মধ্যে একজন আবার আজান দিচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় আজান দিতে হয়।

আমি জানোলা দিয়ে তাকিয়ে আছি। আতঙ্কে অস্থির হওয়া লোকজন দেখতে ভালো লাগছে। তীব্র আতঙ্কেরও কিছু পর্যায় আছে। প্রাথমিক পর্যায়ে তীব্র আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ক্ষুদ্র একটা এলাকার ভেতর ছোটাছুটি করে। আতঙ্ক যত বাড়তে থাকে ছোটাছুটির মাত্রা তত কমতে থাকে। তীব্র আতঙ্কের শেষ পর্যায়ে কোনো ছোটাছুটি নেই।— স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। তখন চোখের মণিও নড়বে না।

মাজেদা খালাকে দেখা যাচ্ছে। তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে বাড়ির সামনের লনে ছোটাছুটি করছেন। তিনি যেদিকে যাচ্ছেন তার কাজের তিন মেয়েও সেদিকে যাচ্ছে। শুধু খালু সাহেব এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। তার হাতে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ম্যাগাজিন। তাঁর ঠোঁটে সিগারেট। তবে সিগারেটে আগুন নেই। ছুটে নিচে নামার সময় নিশ্চয়ই লাইটার নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন। জহিরকে দেখতে পাচ্ছি না। সে কি গেট খুলে বাইরে চলে গেছে? এক দৌড়ে ফুলফুলিয়ার কাছে চলে যায় নি তো? ফুলফুলিয়া যখন দেখবে খালি গায়ে একজন যুবক দৌড়াতে দৌড়াতে তার কাছে আসছে তখন সে ভালোই মজা পাবে।

মাজেদা খালার বাড়ির মূল লোহার গোটটা বন্ধ। তবে মূল গেটের সঙ্গে বাচ্চা গোটটা খোলা। সেই গেটের ভেতর দিয়ে মাঝে মাঝেই লোকজন উঁকি দিচ্ছে। খালার বাড়ির গেটে চব্বিশ ঘণ্টা দারোয়ান থাকার কথা। কোনো দারোয়ান নেই। যে-কোনো বিপর্যয়ের সময় প্রথম যারা দায়িত্ব ফেলে পালিয়ে যায়। তারা হলো দারোয়ান এবং সিকিউরিটি গার্ড।

হিমু এই হিমু!

মাজেদা খালা আমাকে দেখতে পেয়েছেন। মনে হয় তার আতঙ্ক সহনীয় পর্যায়ে চলে এসেছে। তীব্র আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ কাউকে চিনতে পারে না। মস্তিষ্কের যে অংশে পরিচিতিমূলক তথ্য থাকে। সেই অংশ কাজ করে না। মাজেদা খালা ক্ষিপ্ত গলায় চেঁচালেন–
এই হিমু, কথা বলছিস না কেন?

আমি বললাম, খালা কেমন আছ?

গাধা তুই ফাজলামি করছিস কেন? এখন কেমন আছি জিজ্ঞেস করার মানে কী? নেমে আয়।

তোমরা কি চা খাবে? চায়ের পানি বসিয়ে দেই?

নেমে আয় তো। এক্ষুণি নাম।

মাজেদা খালার পাশে খালু সাহেব এসে দাঁড়ালেন। ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন— Himu bring me a lighter, খালু সাহেবের গলা ভাঙা ছিল না। মনে হচ্ছে ভূমিকম্পে তাঁর গলা ভেঙে গেছে। ভূমিকম্পে ঘর বাড়ি ভাঙে বলে জানি, মানুষের গলা ভাঙে এটা শুনি নি।

আমি বললাম, খালু সাহেব পোর্চের লাইটটা কি জ্বলিয়ে দিব?

খালু সাহেব বললেন, কেন?

আমি বললাম, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ম্যাগাজিনটা পড়তে পারতেন। লনে কতক্ষণ থাকতে হয় তার তো ঠিক নেই।

খালু সাহেব বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। নিশ্চয়ই ইংরেজিতে গালাগালি।

দোতলা থেকে শোনা যাচ্ছে না।

রাত বারটা।

ভূমিকম্প ভীতি সামলে মাজেদা খালা বাড়িতে উঠে এসেছেন। রান্নাবান্না কিছু হয় নি। তাঁর তিন কাজের মেয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেছে। খালা খালু দুজনই বসার ঘরের সোফায় পাশাপাশি বসে আছেন। আমি বসে আছি তাদের ডানপাশের সোফায়। খালু সাহেব ভাঙা গলায় স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছেন। গল্পের বিষয়বস্তু— ভূমিকম্প।

বুঝলে মাজেদা— বিরাট কোইনসিডেন্স। যখন ভূমিকম্প হচ্ছিল তখন আমি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে ভূমিকম্প নিয়েই একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম। আর্টিকেলের নাম— Untamed Nature, আর্টিকেলের একটা চেপ্টার ভূমিকম্পের বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে। ঐ চেপ্টারটা পড়তে শুরু করেছি তখনই ভূমিকম্প শুরু হলো। ইন্টারেস্টিং কেইনসিডেন্স না?

খালা জবাব দিলেন না। তিনি ভাবলেশহীন মুখে টিভির দিকে তাকিয়ে আছেন। টিভিতে এখনো সিএনএন। এখনো টিভি শব্দহীন। মাজেদা খালাকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর আতঙ্ক এখনো পুরোপুরি যায় নি। স্বামীর প্রশ্নের জবাব তো তিনি দিলেনই না, উঠে নিজের ঘরে চলে গেলেন। খালু সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হিমু তোমার কাছে কোইনসিডেন্সটা ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে না?

কোনো আর্টিকেল পড়বেন না।

কেন?

বজ্রপাতের উপরে আর্টিকেল পড়লেন–সঙ্গে সঙ্গে আপনার উপর বজ্রপাত হলো। পুড়ে কয়লা হয়ে গেলেন।

তুমি কি রসিকতা করার চেষ্টা করছ?

জ্বি।

তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক রসিকতার না। রসিকতা করবে না।

জ্বি আচ্ছা।

একটা জিনিস খেয়াল রাখবে। তোমার নাম হিমু। তুমি একজন ভ্যাগাবন্ড। তুমি চার্লি চ্যাপলিন না।

জ্বি আমি খেয়াল রাখব।

তুমি জহিরের ঘরে যাও। ওকে বিরক্ত করা। ওর সঙ্গে হিউমার করার চেষ্টা কর। আমার সঙ্গে না।

জি আচ্ছা।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। খালু সাহেব থমথমে গলায় বললেন, তোমাকে আরেকটা বিষয় বলি। দয়া করে সহজ উত্তর দেবে, প্যাচানো উত্তর দেবে না।

জ্বি আচ্ছা।

ভূমিকম্প হচ্ছে। সবাই দৌড়ে নেমে খোলা জায়গায় চলে গেল। তুমি ঘরে বসে রইলো। খুব ভালো কথা, থাক ঘরে বসে, কিন্তু জহিরকে আটকে রাখলে কেন?

খালু সাহেব, আমি জহিরকে আটকে রাখি নি। ও হঠাৎ খালি গায়ে দৌড় দিল। যাকে বলে ভো দৌড়।

দৌড়ে কোথায় গেল?

প্রথম বুঝতে পারি নি কোথায় গেছে। পরে ওকে আবিষ্কার করলাম ছাদে। সে ভাষায় আকাশে লেখা ভাসে। সত্যি কি-না দেখতে গেছে।

যে ছেলে ফিজিক্স পড়ছে সে ভূমিকম্পে আকাশে হাবিজাবি লেখা হয়। এইসব বিশ্বাস করে? ওকে তো কানে ধরে উঠবোস করানো দরকার। ওকে আমার কাছে পাঠাও তো। তার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

খালু সাহেব আজ কথা না বলে আরেকদিন বলুন। এখন সে একটু ব্যস্ত আছে। ব্যস্ত বলেই আমি আপনার কাছে বসে আছি। আপনি বিরক্ত হচ্ছেন জেনেও বসে আছি।

কী নিয়ে ব্যস্ত?

সে টেলিপ্যাথির মাধ্যমে একজনের কাছে খবর পাঠাবার চেষ্টা করছে। জানার চেষ্টা করছে ভূমিকম্পে তাদের কোনো ক্ষতি হয়েছে কি-না। পদ্ধতিটা খুব সহজ। শবাসন হয়ে চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়...

চুপ কর।

জ্বি আচ্ছা।

খালু সাহেব থমথমে মুখে জহিরের ঘরের দিকে এগুলেন। আমিও তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। ইন্টারেস্টিং কোনো পরিস্থিতি হয় কি-না দেখার জন্যে যাওয়া। তেমন কিছু হলো না। খালু সাহেব হতভম্ব হয়ে দেখলেন, তাঁর পুত্র চোখ বন্ধ করে সরল রেখা হয়ে শুয়ে আছে। মুখে বিড়বিড় করছে। খালু সাহেব যেভাবে নিঃশব্দে ছেলের ঘরে ঢুকেছেন সেইভাবে নিঃশব্দেই ছেলের ঘর থেকে বের হলেন। আমাকে ইশারায় তার পেছনে পেছনে আসতে বললেন। আমিও বাধ্য ছেলের মতো তাকে অনুসরণ করলাম। তিনি আমাকে সিঁড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে কঠিন গলায় বললেন, হিমু তুমি নানাবিধ যন্ত্রণা তৈরি করা। আমি আমার পরিবারে কোন যন্ত্রণা চাই না। তুমি আর এ বাড়িতে আসবে না। তুমি এক্ষুণি বিদেয় হও।

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, আমার রাতে খাওয়ার কথা। ইলিশ মাছ ভাজা হচ্ছে। কথা বাড়বে না। বিদেয় হও। আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম। খালু সাহেব দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখ থমথম করছে।

২. রাতে কাউকে কিছু না বলে

হিমু,

তুই রাতে কাউকে কিছু না বলে চলে গেলি কেন? তুই নিজেকে কী ভাবিস? যা মনে আসে করে বেড়াবি? তোকে কেউ কিছু বলতে পারবে না।? বাংলাদেশের সব মানুষের মাথা কি তুই কিনে নিয়েছিস?

ঐ রাতে কী ঘটেছিল আমার কাছে শোন। আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছিল। আমি বাতি বন্ধ করে শুয়েছিলাম। এতে মাথা ধরা আরো বাড়ল। তুই বোধহয় জানিস না শুয়ে থাকলে আমার মাথা ধরা বাড়ে। আমার সবই উল্টা। যাই হোক মাথা ধরা যখন খুব বাড়ল তখন মাথা ধরার টেবলেটের খোঁজে গেলাম তোর খালুর কাছে। দেখি সে একা মুখ আমসি করে বসে। আছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হিমু কোথায়? তোর খালু বলল, জানি না। কোথায়। আমি বললাম, সে চলে গেছে না কি? তোর খালু বলল, জানি না। যেতেও পারে, খবর না দিয়ে যে আসে সে খবর না দিয়ে চলে যায়। তখন আমি গোলাম জহিরের ঘরে। সেখানেও তুই নেই। কাজের মেয়েরাও কেউ কিছু বলতে পারে না। গেটের দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম। সেও বলল, গেট দিয়ে কাউকে যেতে দেখে নি। তোর খালু বলল, চলে গেছে— গেছে। এত হৈচৈ করছ, কেন? টেবিলে খাবার দিতে বলে।

হিমু, কাউকে কিছু না বলে চলে যাওয়াটা ঠিক না। আমি রাগ করেছি এবং মনে কষ্ট পেয়েছি। আমি যাদেরকে বেশি স্নেহ করি। তারাই আমাকে কষ্ট দেয়। জহিরের কথাই মনে করে দেখ।

ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডারে জহিরের সব কথাবার্তা এই নিয়ে পাঁচবার শুনলাম। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এইসব কী ধরনের কথাবার্তা? আমার তো মনে হয় ছেলেটা পাগল হয়ে গেছে। তার ডাক্তারি চিকিৎসা দরকার। কোনো সুস্থ মাথার ছেলে এ ধরনের কথা বলতে পারে না। ভূমিকম্পের রাতে সে তার বাবার সঙ্গে যে কথাবার্তা বলেছে সেটা শুনলেই যে কেউ বলবে, ছেলেকে পাবনা মেন্টাল হসপিটালে পাঠিয়ে দাও। ঐটাই তার জন্যে উপযুক্ত জায়গা। ঘটনা। কী হয়েছে শোন। বাপ-ছেলে খেতে বসেছে। আমি বসি নি। প্রথমত, আমার মাথার যন্ত্রণা; দ্বিতীয়ত, তোর জন্য রান্না-বান্না করিয়েছি। আর তুই না বলে পালিয়ে গেছিস; যাই হোক মূল ঘটনা শোন। জহিরের বাবা বলল, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

জহির বলল, ভালোই হচ্ছিল। তবে এখন হচ্ছে না।

জহিরের বাবা বলল, হচ্ছে না কেন?

জহির বলল, ফিজিক্স পড়ে কোনো লাভ নেই বাবা।

লাভ নেই কেন?

প্রকৃতিকে বোঝার জন্যেই ফিজিক্স পড়া। আমি চিন্তা করে দেখেছি। এখন পর্যন্ত ফিজিক্সের যে উন্নতি হয়েছে তা দিয়ে প্রকৃতিকে কিছুতেই বোঝা যাবে না। বরং উল্টো হবে। ফিজিক্সের জ্ঞান আমাদের চিন্তাকে আরো ধোঁয়াটে করে ফেলবে।

জহিরের বাবা তখন শান্ত গলায় বলল, আমি ফিজিক্স জানি না। আমি ইতিহাসের ছাত্র। তুই কী বলছিস বুঝিয়ে বল।

জহির বলল, সব কিছু বোঝাতে পারব না। একটা শুধু বলি, ফিজিক্স বলছে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। বিগ ব্যাং থেকে। প্রচণ্ড শব্দে কসমিক ডিম ফেটে মহাবিশ্ব তৈরি হলো। যে মুহূর্তে কসমিক ডিম ফাটল সেই মুহূর্ত থেকে সময়ের শুরু। কসমিক আগে কী ছিল কিছুই বলতে পারছে না।

ডিম ফাটার আগে কী ছিল ফিজিক্স তা বলতে পারছে না বলে তুই ফিজিক্স পড়বি না?

না। আমার কাছে ফিজিক্স পড়া অর্থহীন মনে হচ্ছে।

কী করবি বলে ঠিক করেছিস?

বাবা, আমি একটা কফিশপ চালাব।

বুঝতে পারছি না। কী বলছিস। কী চালাবি?

কফিশপ। ছোট্ট ঘরোয়া ধরনের কফিশপ। দোকান সারাদিন বন্ধ থাকবে। খুলবে সন্ধ্যার পর। কাটায় কাটায় বারটার সময় কফিশপ বন্ধ হবে।

রসিকতা করছিস নাকি?

না, রসিকতা কেন করব? কফিশপের নাম ঠিক হয়ে গেছে— শুধুই কফিতা।

নাম শুধুই কফিতা?

হ্যাঁ, আমার কফিশপের নাম কফিতা। এখন কী করছি জানো বাবা? যে মাগে করে কফি দেয়া হবে সেই মগের ডিজাইন করছি।

মগের ডিজাইন করছিস?

হ্যাঁ। কোন রঙের মাগে কফির গেরুয়া রঙ ভালো ফুটে সেটা দেখা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে গাঢ় সবুজ রঙের মাগে কফির রঙ ভালো ফুটে। কাজেই আমাদের মগের রঙ হলো গাঢ় সবুজ। এই মগ হবে গ্রাসের মতো। মাগে চায়ের কাপের মতো কোনো বোটা থাকবে না।

বোটা থাকবে না?

জ্বি না। কেন থাকবে না শুনতে চাও?

শুনি কেন থাকবে না।

পানির গ্রাস আমরা হাত দিয়ে ধরি। ঠাণ্ডা পানির গ্রাস হাত দিয়ে ধরেই পানির শীতলতা আমরা টের পাই। আমাদের ভালো লাগে। গরম কফির উষ্ণতাও ঠিক একইভাবে আমরা কফির মগ হাত দিয়ে ধরা মাত্র টের পাব।

আমাদের ভালো লাগবে।

তুই তাহলে কফির দোকান দিচ্ছিস?

জ্বি।

তোর নেক্সট পরীক্ষা যেন কবে?

নয় তারিখ–সাত দিন আছে। পরীক্ষা তো দিচ্ছি না!

পরীক্ষা দিচ্ছিস না?

না। কফিশপের আইডিয়া মাথায় আসামাত্র পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছি।

জহিরের বাবা এরপরেও বেশ সহজভাবে খাওয়া শেষ করল। বেসিনে হাত ধুয়ে এসে আবার খাবার টেবিলে বসল। জহিরের খাওয়া তখনো শেষ হয় নি। জহিরের বাবা শান্তমুখে ছেলের খাওয়া দেখতে লাগল। খাওয়া শেষ হবার পর জহিরের বাবা বলল, নয় তারিখে তুই পরীক্ষা দিতে যাবি। যদি না যাস তাহলে ঐ দিনই এক বিস্ত্রে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবি। কথা চালাচালি আমার পছন্দ না। আমি আমার কথা বলে শেষ করলাম। এই বিষয়ে নয়। তারিখ পর্যন্ত আর কোনো কথা বলব না।

জহির বলল, আচ্ছা।

হিমু, এই হলো ঘটনা। জহিরের বাবাকে আমি মোটেই দোষ দিচ্ছি। না। সে তো তাও ধৈর্য ধরে ছেলের কথা শুনেছে। আমার ইচ্ছা করছিল–খাবার টেবিলেই ঠাস করে ছেলের

গালে এক চড় মারি। যাতে এক চড়ে মাথার সব আইডিয়া নাকের ফুটো দিয়ে বের হয়ে যায়।

ঐ ঘটনার পর আমি তোর খালুকে ফুলফুলিয়া মেয়েটার কথা বলেছি। আমি চিন্তা করে দেখলাম, ছেলে যেভাবে বিগড়াচ্ছে ফুলফুলিয়ার ব্যাপারটা আর গোপন রাখা ঠিক হবে না। ক্যাসেট করা কথাবার্তাও তোর খালুকে শুনিয়েছি। বেচারা যে কী পরিমাণে শকড হয়েছে তুই বিশ্বাস করবি না। তিনদিনের একটা কনফারেন্সে তার সুইডেনে যাবার কথা ছিল। এটা সে বাতিল করেছে। সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিল, আবার সিগারেট ধরেছে। ভোস ভোস করে দিনরাত সিগারেট টানছে। আমি কিছু বলছি না। সিগারেট টেনে যদি টেনশন কিছু কমে তাহলে কমুক। গতকাল রাতে ঢাকা ক্লাবে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরেছে। মদ খেয়ে। সিগারেটের সঙ্গে মদ খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে। আবারো মদ ধরবে। চিন্তা করে। দেখ আমি কী বিপদে পড়েছি। তোর খালুকে আমি এখন কিছুই বলব না। নয় তারিখ পার হোক। তারপর দেখা যাক পানি কোন দিকে গড়ায়।

হিমুরে, আমি মহাবিপদে আছি। তোকে যে বাড়িতে আসতে বলব, তোর সঙ্গে পরামর্শ করব সেই উপায় নেই।

জহিরের বাবা তোর এ বাড়িতে ঢোকা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। দারোয়ানকে ডেকেও বলে দেয়া হয়েছে তুই যেন এ বাড়িতে ঢুকতে না পারিস। জহিরের বাবার ধারণা তার ছেলের এই সমস্যার মূলে আছিস তুই। তুই নাকি মানুষের মাথায় হালকা বাতাস দিয়ে আইডিয়া ঢুকিয়ে সটকে পড়িস। আমি তাকে বলেছি–এটা ঠিক না। হিমু আমাদের দলে। জহিরের কথাবার্তা খুব কায়দা করে হিমুই রেকর্ড করে এনেছে। তোর খালু। বলেছে–হিমু সব

দলেই আছে। জহির যদি ফুলফুলিয়াকে বিয়ে করে তাহলে দেখা যাবে উকিল বাবাহিমু। তোর খালুর কথাও আমি ফেলতে পারছি না। বল তো আমি কী করি?

এদিকে ফুলফুলিয়া মেয়েটার বিষয়ে তোর খালুও কিছু খোঁজখবর বের করেছে। মেয়েটা কী করে শুনলে তুই মাথা ঘুরে পড়ে যাবি। সে একটা ক্লিনিকে আয়ার কাজ করে। রোগীদের গু মুত পরিষ্কার করে। অবস্থাটা চিন্তা করে দেখ।

আমি মানত করেছি। সমস্যা সমাধান হলেই আজমীর শরিফে চলে যাব। খাজা বাবার দরবারে শুকরানা নামাজ পড়ব। সেখানকার এতিম মিসকিনদের একবেলা খাওয়াব। আমার যে কী রকম অস্থির লাগছে তোকে বলে বুঝাতে পারব না।

মানসিক যে অবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। আমি চাই না সেটা আরো খারাপ হোক। তবে তুই দূর থেকে আমার একটা উপকার করতে পারিস। ফুলফুলিয়া মেয়েটার ঠিকানা দিচ্ছি। তার সঙ্গে দেখা করে এই মেয়েটার বিষয়ে আমাকে একটা রিপোর্ট দে। ভয় দেখিয়ে কিংবা লোভ দেখিয়ে জহিরের কাছ থেকে মেয়েটাকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। এর জন্যে টাকা পয়সা যা লাগে আমি খরচ করব। কেয়ারটেকারের কাছে ঠিকানা আছে। তুই তার কাছ থেকে ঠিকানাটা নে। ওর কাছে দশ হাজার টাকাও দিয়ে দিয়েছি। প্রয়োজনে গুণ্ডা লাগিয়ে মেয়েটাকে হুমকি ধমকি দিয়ে অন্য কোথাও সরিয়ে দে। এই উপকারটা তুই আমার করা।

ইতি

তোর মাজেদা খালা

পুনশ্চ : হিমু আমার মাথাটা আসলেই খারাপ হয়ে গেছে। যে ঘটনাটা তোকে জানাবার জন্যে চিঠি লিখেছিলাম। সেই ঘটনাই জানানো হয় নি। অথচ চিঠি শেষ করে বসে আছি। আসলে আমি আর টেনশন নিতে পারছি না বলে। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সেদিন মাথা ধরার ট্যাবলেট ভেবে তোর খালুর দুটা প্রেসারের ওষুধ খেয়ে ফেলেছি। তারপর দেখি ধুম করে প্রেসার নেমে যাচ্ছে। মাথায় পানি ঢালাঢালি–ডাক্তার ডাকাডাকি।

যাই হোক, মূল ঘটনাটা মন দিয়ে শোন। এখন পর্যন্ত ঘটনাটা নিয়ে কারো সঙ্গেই আলাপ করি নি। শুধু আমার কাজের মেয়ে তিনটিকে বলেছি। কাজটা ভুল হয়েছে। তিনটা মেয়ে ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। তোর খালুকে ঘটনাটা বলতে গিয়েও বলি নি। তাকে যা বলব— সে গম্ভীর হয়ে বলবে, এটা কিছু না। তুমি স্বপ্ন দেখেছি। চোখের সামনে দেখা জলজ্যান্ত জিনিসকে কেউ যদি বলে স্বপ্ন তাহলে কেমন রাগ লাগে তুইই বল?

ঘটনাটা ঘটেছে ভূমিকম্পের রাতে। তখন ঘটনাটা আমি নিজেও বুঝতে পারি নি। ভূমিকম্পের ভয়ে একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। কী দেখছি বা কী দেখছি না বুঝতেই পারি নি। যতই দিন যাচ্ছে ব্যাপারটা ততই পরিষ্কার হচ্ছে–আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

ভূমিকম্পের রাতের কথা তোর নিশ্চয়ই মনে আছে। দরজা ভেতর থেকে লক করা। আমি দরজা খুলতে পারছি না। চাবি পাচ্ছি না। ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ার উলট-পালট করছি। তোর খালু পাগলের মতো বিড়বিড় করছে। এক সময় ছুটে গেলাম জহিরের ঘরে। তখন তুই বললি বালিশের নিচে খুঁজে দেখতে। আমি গেলাম শোবার ঘরে। আমি মশারি খাটিয়ে ঘুমাই। ঢাকায় ডেঙ্গু রোগ দেখা দেয়ার পর থেকে এই ব্যবস্থা। রাত আটটা বাজতেই কাজের মেয়ে মশারি খাটিয়ে দেয়। আমি গোলাম অবাক হলাম— দেখি বাড়ির চাবি। চাবি

হাতে নিতে গিয়ে আরেকটা জিনিস দেখলাম— দেখি বুড়ো একজন মানুষ কুজো হয়ে মশারির ভেতর বসে আছে। তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তখন আমার মাথাতেই নেই যে এটা একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য। আমার মশারির ভেতর কোনো বুড়ো মানুষ বসে থাকতে পারে না। ভূমিকম্পের ভয়ে আমি এতই অস্থির যে বুড়ো মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এটা আমার মাথায় ঢুকাল না। আমি চাবি নিয়ে দরজা খুলে দৌড়ে নিচে চলে গেলাম।

হিমু, ব্যাপারটা কী বল তো? আমার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে আমার কি কথা বলা উচিত?

সাক্ষাতে এটা নিয়ে তোর সঙ্গে কথা বলব। আপাতত তুই ফুলফুলিয়ার ব্যাপারটা দেখ। প্রয়োজনে কেয়ারটেকারকে সাথে নিয়ে যা। এই ধরনের মেয়েরা হিংস্র প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাদের হাতে পোষা গুণ্ডাপাণ্ডাও থাকে। তোকে একা পেয়ে কিছু করে বসতে পারে। দুজন থাকলে কিছুটা রক্ষা। ভালো থাকিস।

ফুলফুলিয়া যার নাম তার স্বভাব-চরিত্র যাই হোক সে দেখতে খুব সুন্দর হবে। এরকম ধারণা হবেই। আমি ধরেই নিলাম মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকব। মনে মনে বলব, বাহ।

মেয়েটির বাসা ঝিকাতলায়। ঠিকানা লেখা কাগজ হাতে নিয়ে তার বাসা খুঁজছি। আর কল্পনা করছি মেয়েটা দেখতে কেমন হবে। গায়ের রঙ গৌর বর্ণ। মাথা ভর্তি চুল। কুচকুচে কালো চুল না। সামান্য পিঙ্গল ভাব আছে। অতিরিক্ত ফর্স মেয়েরা সাধারণত পিঙ্গলকেশী হয়। রোগা, গোলগাল মুখ। খুবই ছটফট স্বভাবের মেয়ে। স্থির হয়ে এক জায়গায় বসেও

থাকতে পারে না। অকারণে হেসে ফেলার বাতিকও আছে। সিরিয়াস ধরনের কথাতেও মুখ আড়াল করে হাসছে।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর যে মেয়েটি দরজা খুলে দিল সে-ই যে ফুলফুলিয়া এতে আমার মনে সন্দেহের তিল মাত্রও নেই। অথচ কল্পনার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। শান্ত চেহারার শ্যামলা মেয়ে। রোগাটা ঠিক আছে, তবে মুখ গোলাকার না, লম্বাটে। মনে হয় রুটি বানাচ্ছিল। হাতে ময়দা লেগে আছে। ফুলফুলিয়া অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। আমাকে দেখে এত বিস্মিত হচ্ছে কেন, আমি বুঝতে পারছি না। আমার চেহারা বিস্মিত হবার মতো না। আমি সহজ গলায় বললাম, ফুলফুলিয়া কেমন আছ?

মেয়েটা খানিকটা ভীত গলায় বলল, ভালো আছি।

রুটি বানাচ্ছিলে নাকি?

মেয়েটার গলা থেকে বিস্ময় ভাবটা চলে গেল। সেখানে চলে এলো আনন্দ। সে বলল, আপনি হিমু ভাই না?

আমি বললাম, হ্যাঁ। চিনেছ কীভাবে? জহির নিশ্চয়ই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার চেহারার বর্ণনা তোমার কাছে করেছে।

উনি কিছুই বলেন নি। উনি শুধু বলেছেন হিমু ভাইজান যদি তোমার কাছে আসেন তাহলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলবে। তিনি দেখতে কেমন, এইসব কিছু বলার দরকার নেই।

আমি যে হলুদ পাঞ্জাবি পরি এটা নিশ্চয়ই বলেছে।

না, হলুদ পাঞ্জাবির কথাও বলেন নি। বাসা অন্ধকার কেন?

বারান্দার বাতিটা চুরি হয়ে গেছে। এই জন্যে অন্ধকার। ভেতরে আসুন, ভেতরে

আলো আছে।

তুমি ছাড়া বাসায় আর কে আছে?

রহমতের মা বলে একজন মহিলা আছেন। উনি আমার পাহারাদার। উনি ছাড়া আর কেউ নেই।

তোমার বাবা কোথায়?

ফুলফুলিয়া মিষ্টি করে হেসে বলল, বাবা আমার উপর রাগ করে দুপুরবেলা চলে গেছেন। বলে গেছেন। আর ফিরবেন না।

প্রায়ই কি এরকম রাগ করে চলে যান?

জ্বি।

রাগ ভেঙে গেলে দিনে দিনেই কি ফেরেন?

না, সব দিন ফেরেন না। এমনও হয়েছে চার পাঁচদিন পরে ফিরেছেন।

আমি ফুলফুলিয়ার সঙ্গে একটা ঘরে এসে ঢুকলাম। ঘরে সস্তার একটা খাট পাতা আছে। টেবিল চেয়ার আছে। আলনা আছে। আলনার কাপড়-চোপড় দেখে মনে হচ্ছে এই ঘরে ফুলির বাবা ঘুমান।

হিমু ভাইজান, দুধ ছাড়া এককাপ চা খাবেন?

খাব।

ঘরে খুব ভালো ঘি আছে। গরম রুটিতে ঘি মাখিয়ে চিনি দিয়ে দেই?

দাও।

ফুলফুলিয়া খানিক্ষণ ইতস্তত করে বলল, উনি বলছিলেন। আপনি নাকি একজন মহাপুরুষ। আপনি যে-কোনো অসাধ্য সাধন করতে পারেন। এটা কি সত্যি?

না, এটা সত্যি না।

আপনি কি মানুষের ভবিষ্যৎ বলতে পারেন?

তাও পারি না।

তাহলে উনি কেন এত বড় গলায় আপনার কথা বললেন? আপনি কী পারেন?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি সুখে এবং দুঃখে মানুষের পাশে থাকতে পারি।

সে তো সবাই পারে। আপনার বিশেষত্ব কী?

আমার বিশেষত্ব হচ্ছে। আমি সব সময় একটা হলুদ পাঞ্জাবি পারি। সবাই হলুদ পাঞ্জাবি পরে না।

সব সময় হলুদ পাঞ্জাবি কেন পরেন?

হলুদ পাঞ্জাবি পরার প্রধান কারণ হচ্ছে–হলুদ রঙের কাপড় সহজে ময়লা হয় না। একবার ধুয়ে অনেক দিন পরা যায়।

এটাকে বললেন প্রধান কারণ। অপ্রধান কারণ কী?

অপ্রধান কারণ আমার বাবা। তিনি মহাপুরুষ বানাবার একটা স্কুল খুলেছিলেন। আমি ছিলাম স্কুলের একমাত্র ছাত্র। হলুদ পাঞ্জাবি হলো স্কুল ড্রেস। বাবার ধারণা হয়েছিল গেরুয়া বৈরাগ্যের রঙ। গেরুয়া রঙের কাপড় পরলে মনে বৈরাগ্য আসে। মহাপুরুষদের বৈরাগ্য থাকতে হয়।

ফুলফুলিয়া কথা শুনে মজা পাচ্ছে। আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। ফুলফুলিয়ার পাহারাদারও একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেল। মৈনাক পর্বতের মতো শরীর। সাধারণভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিন্তু ফোস ফোঁস শব্দ হচ্ছে। এ রকম পাহারাদার থাকলে আর চিন্তা নেই। ফুলফুলিয়া বলল, আপনার বাবা কি সত্যি সত্যি আপনাকে মহাপুরুষ বানাবার চেষ্টা করেছিলেন?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, বাবা রীতিমতো স্কুল খুলে বসেছিলেন!। স্কুলের তিনিই প্রিন্সিপাল, তিনিই শিক্ষকমণ্ডলি, তিনিই ড্রিল স্যার। এত করেও শেষ রক্ষা হয় নি। স্কুল থেকে পাশ করে বের হবার আগেই বাবার মৃত্যু। বাবার মৃত্যু মানেই প্রিন্সিপাল স্যারের মৃত্যু, শিক্ষকমণ্ডলির মৃত্যু এবং ড্রিল স্যারের মৃত্যু।

নিজের বাবার মৃত্যুর ব্যাপারটা এত সহজভাবে বলছেন?

মহাপুরুষ স্কুলের ট্রেনিং-এর কারণে বলতে পারলাম। ট্রেনিং না থাকলে বাবার মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে যেত। চোখ ভেজা ভেজা হয়ে যেত। তুমি তাড়াতাড়ি রুটি বানিয়ে নিয়ে এসো। খাওয়া-দাওয়ার পর ইন্টারভ্যু পর্ব।

কীসের ইন্টারভ্যু?

মাজেদা খালাকে তোমার সম্পর্কে একটা রিপোর্ট দিতে হবে।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

কিছু বুঝতে না পারা খুবই ভালো কথা। যত কম বুঝবে তত ভালো। কাগজ-কলম আছে না? কাগজ কলম দাও–আমি পয়েন্টগুলো লিখে নেই। কী কী প্রশ্ন করব ঠিক করি।

ফুলফুলিয়া আনন্দিত গলায় বলল, আমার এখন রুটি বানাতে ইচ্ছে করছে না। আপনার প্রশ্নগুলো শুনতে ইচ্ছে করছে।

ঠিক আছে। প্রশ্নোত্তর পর্ব আগে শেষ হোক।

ফুলফুলিয়া কাগজ-কলম। এনে দিল। খাটের উপর বসল। আনন্দ ও উত্তেজনায় তার চোখ চকচক করছে। আমি বললাম, তোমার নাম কী?

ফুলফুলিয়া।

ফুলফুলিয়া কোনো নাম না, ভালো নাম বলো।

আক্তারী জাহান।

বয়স?

একুশ।

উচ্চতা?

বলতে পারছি না। উচ্চতা কখনো মাপি নি।

ওজন নিয়েছ? ওজন কত?

ওজনও নেই নি।

যাই হোক অনুমান করে লিখে নিচ্ছি— উচ্চতা পাঁচ ফুট পাঁচ। ওজন পঞ্চাশ কেজি। পড়াশোনা কি?

ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়েছি।

কোন ডিভিশন?

ফাস্ট ডিভিশন।

বর্তমানে কী করছ?

আমাদের এখানে একটা ক্লিনিক আছে। ক্লিনিকে শমসের আলি বলে একজন ডাক্তার আছেন। আমি তার রোগীদের সিরিয়েল দেই।

ক্লিনিকে আয়ার কাজ কখনো করেছ?

জ্বি করেছি। শুরুতে তাই করতাম। ডাক্তার চাচা সেখান থেকে আমাকে নিয়ে রোগী দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন।

কী খেতে পছন্দ? আলাদা করে আইটেম বলবে। মাছের মধ্যে কোন মাছ?

ইলিশ মাছ।

ভর্তার মধ্যে কোন ভর্তা?

শুকনা মরিচের ভর্তা।

পোলাও, ভাত, খিচুড়ি –এই তিনটের মধ্যে কোনটা পছন্দ?

খিচুড়ি।

শুকনা খিচুড়ি না ঢলঢালা খিচুড়ি?

শুকনা।

পছন্দের ফুল?

যুঁই ফুল।

একজন খুব পছন্দের মানুষের নাম বলো।

ফুলফুলিয়া হেসে ফেলল।

আমি বললাম, হাসছ কেন?

ফুলফুলিয়া বলল, হাসছি কারণ আমি যখনই আমার খুব পছন্দের মানুষের নাম বলব। আপনি বিশ্বাস করবেন না। কারণ আমার খুব পছন্দের একজন মানুষ হচ্ছেন আপনি অথচ আপনার সঙ্গে মাত্র কিছুক্ষণ আগে আমার দেখা হয়েছে।

তোমার খুব অপছন্দের একজন মানুষের নাম বলো।

আমার বাবা।

জহির তোমার খুব পছন্দের তালিকায় নেই?

না। তিনি মোটামুটি পছন্দের একজন।

মোটামুটি পছন্দের একজনকে বিয়ে করতে যাচ্ছ?

ফুলফুলিয়া চমকে উঠে বলল, তাকে আমি কেন বিয়ে করব?

বিয়ের কোনো কথা তার সঙ্গে তোমার হয় নি?

না।

জহির তো বিয়ে করার জন্যে খুবই ভালো ছেলে। জহির যে কত ভালো ছেলে সেই সার্টিফিকেট কিন্তু আমি তোমাকে দিতে পারি।

সার্টিফিকেট দিতে হবে না। মানুষের চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় মানুষটা ভালো না মন্দ।

তাই না কি?

হ্যাঁ তাই। পুরুষ মানুষের পক্ষে হয়তো এটা বোঝা সম্ভব না। কিন্তু সব মেয়ের এই ক্ষমতা আছে।

জহির তো পরিকল্পনা করে রেখেছে তোমাকে কাজি অফিসে নিয়ে বিয়ে করবে। বিয়েতে আমি একজন সাক্ষী। তোমার তরফ থেকে যদি কোনো সাক্ষী না পাওয়া যায় দ্বিতীয় সাক্ষীও আমিই জোগাড় করব।

কী সর্বনাশ! এইসব আপনি কী কথা বলছেন!! আমার তো বিয়ে হয়েছে। আমার স্বামী নাইক্ষ্যংছড়ি পোস্টাপিসের পোস্টমাষ্টার। ঐ এলাকায় পাহাড়ি-বাঙালিতে ঝামেলা হচ্ছে এই ভয়ে সে আমাকে নিতে চায় না।

আমি বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, পবিত্র গাভী।

ফুলফুলিয়া বলল, পবিত্র গাভী মানে কী?

হলি কাউ। ঐটাই বাংলা করে বললাম— পবিত্র গাভী।

ফুলফুলিয়া বলল, পবিত্র গাভী তো আপনার আগে আমার বলা উচিত।

বলো। ফুলফুলিয়া খুব গম্ভীর গলায় বলল, পবিত্র গাভী। বলেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

আমি বললাম, যাও রুটি বানিয়ে নিয়ে এসো। বেশি রাত করা যাবে না। মাজেদা খালার কেয়ারটকার অপেক্ষা করছে। তোমার উপর প্রতিবেদনটা হাতে হাতে নিতে যাবে।

মাজেদা খালাটা কে?

মাজেদা খালা হচ্ছেন তোমার হলেও হতে পারত শাশুড়ি। খুবই ইন্টারেস্টিং মহিলা। লোকজন গাছের ওপর ভূত বসে থাকতে দেখে। উনি একমাত্র মহিলা যিনি তাঁর শোবার ঘরের মশারির ভেতর ভূত বসে থাকতে দেখেন। বৃদ্ধ ভূত। old man and the sea-এর মতোই Old man and the mosquito net.

আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

কথা বোঝার দরকার নেই। তুমি তোমার কাজ কর। আমি এখানে বসেই প্রতিবেদনটা লিখে ফেলি। দীর্ঘ প্রতিবেদনের দরকার নেই। ঘটনা যা দাঁড়িয়েছে সংক্ষিপ্ত চিঠি দিয়েই কাজ। সারা যায়। মাজেদা খালাকে সংক্ষেপ করে আমি লিখলাম প্রিয় মাখালা। অন্যরকম একটা অর্থ দাঁড়িয়ে গেল। চিঠির শুরুই হলো রহস্যময়।

প্রিয় মা-খালা,

ফুলফুলিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে। এই মুহুর্তে আমি ফুলফুলিয়ার বাবার শোবার ঘরে বসে আছি। ফুলফুলিয়া রুটি সেঁকতে গিয়েছে। চা-রুটি খেয়ে চলে আসব। ফুলফুলিয়া মেয়েটার বায়োডাটা আলাদা একটা কাগজে লিখে দিলাম। ওজন এবং উচ্চতা অনুমানে লিখলাম। এই দুটি তথ্যে কিছু ভুল থাকতে পারে।

মেয়েটিকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হবার একশটি কারণ আছে। আমি শুধু একটা কারণ উল্লেখ করব। কারণটা হলো— বারুদ ভেজা।। মনে হচ্ছে তুমি কিছু বুঝতে পারছি না? আমি ব্যাখ্যা করে বলি। একবার যুদ্ধের সময় এক গোলন্দাজ সেনাপতির দায়িত্ব ছিল পাহাড়ের ওপর অবস্থান নেওয়া। সেখান থেকে যখন সে দেখবে শত্রু আসছে তখন সে গোলাবর্ষণ করবে।

শত্রু এলো ঠিকই কিন্তু গোলন্দাজ সেনাপতি গোলাবর্ষণ করল না। তাকে কোর্টমার্শাল করার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। তাকে বলা হলো গোলাবর্ষণ না করার পেছনে তোমার কি কোনো বক্তব্য আছে?

সেনাপতি বলল, গোলাবর্ষণ না করার পেছনে আমার একশ দুটা যুক্তি আছে। তার প্রথমটা হলো–আগের রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। সব বারুদ গেছে ভিজে।

বিচারপতি বললেন, বাকি একশ একটা যুক্তি বলতে হবে না। বারুদ ভেজা এই একটাই যথেষ্ট। যাও তুমি খালাস।

ফুলফুলিয়ার ব্যাপারে বারুদ ভেজার অর্থ হলো— মেয়েটা বিবাহিতা। তার স্বামী নাইক্ষ্যংছড়িতে আছে। পোস্টমাস্টার। পাহাড়ি-বাঙালি সমস্যার কারণে স্ত্রীকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে পারছে না ঠিকই কিন্তু পোস্টমাস্টার হবার সুবাদে প্রতিদিনই একটা করে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছে।

আশা করি ফুলফুলিয়ার ব্যাপারে তোমার সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান হয়েছে। এখন বলো তোমার বৃদ্ধ ভূতের খবর কী? তাকে কি আবারো দেখেছি? আগেরবার সে বিছানায় বসে

ছিল। এখনো কি বসা অবস্থায় পেয়েছ? বসতে পেলেই শুতে চায় এই প্রবচন ভূতদের বেলাতেও যদি খাটে তাহলে এর পরের বার শুয়ে থাকা অবস্থায় দেখার কথা। তুমি ভালো থেকো।

৩. জহির বসে আছে

আমার সামনে জহির বসে আছে। তার গায়ে হালকা কমলা রঙের গেঞ্জি। কী সুন্দর তাকে মানিয়েছে। গেঞ্জির কমলা রঙের আভা তার গালে পড়েছে, খানিকটা পড়েছে তার চোখে—গাল এবং চোখে কমলা রঙ চকচক করছে। আমি বললাম, জহির তোকে সুন্দর লাগছে রে! প্যাকেজ নাটকের নায়কের মতো লাগছে। পার্কে গানের দৃশ্যের শুটিং করার জন্যে নায়ক প্রস্তুত। নায়িকা এখনো আসে নি। নায়িকার জন্যে অপেক্ষা।

জহির হাসল। মিচিকা ধরনের হাসি।

আমি বললাম, তুই হাসছিস কেন? মিচিকা টাইপ হাসি?

জহির বলল, পরীক্ষার হলে যাবার কথা বলে এখানে চলে এসেছি। এটা ভেবে কেন জানি মজা লাগছে।

পরীক্ষা দিচ্ছিস না?

না।

পরীক্ষা যে দিচ্ছিস না খালা-খালু কি জানেন?

এতক্ষণে সম্ভবত জেনে গেছেন। আমি এক ওষুধের দোকান থেকে টেলিফোন করে মা-কে বলেছি।

খালা কী বললেন?

কিছু বললেন না। প্রথমে কোঁ করে একটা শব্দ হলো –তারপর ধপাস শব্দ শুনলাম। মনে হয় মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন। মা খুব সহজে অজ্ঞান হতে পারেন। একবার কী হয়েছে শোন, খাটের উপর বাবার প্যান্টের কালো বেল্ট পড়েছিল। মা সেই বেল্ট দেখে সাপ সাপ বলে চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

এবার অজ্ঞান হয়েছে তোর পরীক্ষার হলে না যাওয়ায়?

মনে হয় হয়েছে। আমি ধপাস শব্দ শুনলাম, আমি যতই হ্যালো হ্যালো করি ওপাশ থেকে কোনো শব্দ আসে না।

তুই মনে হয়। মজা পাচ্ছিস?

পাচ্ছি। ভাইজান শোন, তোমার কাছে আমি খুব জরুরি একটা কাজে এসেছি।

বল শুনি।

একটু পরে বলি? প্রথমে শোন ফুলফুলিয়ার সঙ্গে কীভাবে পরিচয় হলো সেই গল্প।

না প্রয়োজন নেই। তবু গল্পটা বলি? খুবই ইন্টারেস্টিং গল্প। আমি লেখক হলে একটা গল্প লিখে ফেলতাম। হয়েছে কী ভাইজান— বিকাতলা স্টাফ কোয়াটারে আমার এক বন্ধু থাকে। দুপুরবেলা ওর কাছে গিয়েছি। একটা বই নিতে। ও বাসায় ছিল না। চৈত্র মাস, দুপুরে ঝাঝা রোদ। রিকশা পাচ্ছি না। রিকশার খোঁজ করছি–হঠাৎ দেখি একটা মেয়ে দুহাতে

দুটা আইসক্রিম নিয়ে আসছে। দামি কোনো আইসক্রিম না। সস্তার জিনিস— ললিপপ। এমন কোনো অদ্ভুত দৃশ্য না যে আমাকে হা করে তাকিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু ঐ দিন আমি হা করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমি দাঁড়িয়ে আছি সে এগিয়ে আসছে। আমাকে ক্রস করে চলে গেল— তারপরেও আমি তাকিয়ে রইলাম। তারপর হঠাৎ দেখি মেয়েটা দাঁড়িয়ে গেছে। আমার দিকে ফিরে আসছে। সে এসে আমার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, আইসক্রিম খাবেন? নিন। আইসক্রিম খান।

ভাইজান আমি কোনো কথা না বলে আইসক্রিম নিলাম। পাথরের মূর্তির মতো আইসক্রিম হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়েটা বলল, খান আইসক্রিম খান। আমি সঙ্গে সঙ্গে আইসক্রিমে কামড় দিলাম। যেন জীবনে এই প্রথম আইসক্রিম খাচ্ছি। ভাইজান গল্পটা কেমন?

ভালো। মেয়েটা দুটা আইসক্রিম নিয়ে যাচ্ছিল কেন?

সে আর তার বাবা তাদের বাসার দিকে যাচ্ছিল। তারা বাবা আইসক্রিম খেতে চাইল বলেই দুটা আইসক্রিম কেনা হলো। তখন বাবা হঠাৎ কী কারণে মেয়ের ওপর রেগে উল্টো দিকে চলে গেল। মেয়েটা দুটা আইসক্রিম নিয়ে বাসায় ফিরছে। মনে মনে ঠিক করেছে। পথে টোকাই শ্রেণীর কাউকে দেখলে একটা আইসক্রিম দিয়ে দেবে। আমাকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে আইসক্রিমটা আমাকে দিয়ে দিল।

তুই কি করলি? আইসক্রিম খেতে খেতে ফুলফুলিয়ার বাসা পর্যন্ত গেলি?

হ্যাঁ ভাইজান। সে আমাকে যেতে বলে নি। হ্যামিলনের বংশীবাদকের পেছনে পেছনে ছেলেপুলেরা যেভাবে গিয়েছে। আমি ঠিক সেইভাবেই গিয়েছি। একসময় মেয়েটা বলল,

এই বাড়িতে আমরা থাকি। এখন আপনি বাসায় যান। আমাকে আমার বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ। ঘটনাটা কেমন ভাইজান? ইন্টারেস্টিং না?

হুঁ।

ভাইজান আমি ঠিক করেছি। এই ঘটনা নিয়ে একটা ছোটগল্প লিখব। গল্পের নামসবুজ আইসক্রিম। আমি যে আইসক্রিমটা খেয়েছিলাম সেটার রঙ ছিল সবুজ। গল্পে ছেলেটার নাম থাকবে টগর। মেয়েটার নাম থাকবে বেলী। দুটাই ফুলের নাম।

গল্পের নামটা খারাপ না। তবে পাত্র-পাত্রীর নাম ভালো হয় নি।

গল্পের শেষটা ভেবে রেখেছি। গল্পের শেষে টগর এবং বেলী কাজির অফিসে গিয়ে বিয়ে করবে। বিয়ের পর পরই দুজন দুটা সবুজ আইসক্রিম খেতে খেতে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটবে। মিলনাত্মক গল্প।

মিলনাত্মক গল্প না লিখে বিয়োগান্তক লেখা। বাস্তবের সঙ্গে মিলবে। যেমন ধরা এক পর্যায়ে ছেলেটা জানতে পারল যে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। সে খুব মনে কষ্ট পেল। একবার ভাবল সারাজীবন বিয়ে করবে না। সারাজীবন একা থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে করল। তিন বছরের মাথায় তাদের ফুটফুটে একটা মেয়ে হলো। বেলী বলল, ওগো মেয়েটার সুন্দর একটা নাম রাখো তো। আনকমন নাম। টগর বলল, ওর নাম রাখলাম আইসক্রিম।

জহির বলল, বিয়োগান্তক গল্পটাও খারাপ না। দেখি দুভাবেই লিখব। এখন তোমাকে জরুরি কাজের কথাটা বলেই চলে যাব।

যাবি কোথায়?

এখনো ঠিক করিনি কোথায় যাব। বাড়িতে তো যাওয়াই যাবে না। কোনো এক বন্ধুর বাসায় উঠব। তারপর ডিসিসান নেব। ফুলফুলিয়াকে একবার দেখে আসতে পারলে ভালো হতো। সেটা মনে হয় ঠিক হবে না। তুমি কী বলো? ঠিক হবে?

না।

ওর ছবিগুলি তো ওকে ফেরত দেয়া দরকার। ছোটবেলার ছবি দিয়ে দুটা প্রিন্ট বের করেছি। একটা আইনষ্টাইনের সঙ্গে আরেকটা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ছবিটা ভালো হয়েছে। ছবি দেখে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ তার নাতনির দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

চা খাবি?

না ভাইজান, চা খাব না। এখন বিদেয় হব। বেশিক্ষণ থাকলে বাবার হাতে ধরা পড়ে যাব। আমি মোটামুটি নব্বই দশমিক পাঁচ ভাগ নিশ্চিত যে বাবা খবর পেয়েই সরাসরি তোমার কাছে চলে আসবে।

আমারও তাই ধারণা।

বাবার হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাদের দুজনকেই পালিয়ে যেতে হবে। আমি কোথায় যাব এটা এই মুহূর্তে ঠিক করে ফেললাম।

কোথায় যাবি?

কোথাও যাব না। শুধু হাঁটব।

শুধুই হাটবি মানে?

ভাইজান, তুমি ফরেস্টগাম্প ছবিটা দেখছ?

না।

ফরেস্টগাম্প ছবিতে অভিনেতা টম হ্যাংকস হাঁটা শুরু করে। দিনের পর দিন কোনো কারণ ছাড়াই হাটে। হাঁটতে হাঁটতেই তার দাড়ি গোঁফ গজিয়ে যায়। আমিও টম হ্যাংকস এর মতোই হাঁটব। তবে উদ্দেশ্যবিহীন হাঁটা না। আমি হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করব।

কী চিন্তা করবি?

পৃথিবীতে যে মানুষের মতো ইন্টেলিজেন্ট প্রাণী এসেছে, এরা কেন এসেছে? কেন প্রকৃতি এমন এক বুদ্ধিমান প্রাণী সৃষ্টি করল? প্রকৃতি মানুষের কাছে কী চাচ্ছে?

হেঁটে হেঁটে এমন জটিল চিন্তা করবি?

হুঁ। ভাইজান আমি হাঁটা শুরু করব তেতুলিয়া থেকে। হাঁটতে হাঁটতে বাংলাদেশের শেষ সীমানা টেকনাফের শাহপরীতে যাব। সেখানে সমুদ্রে নেমে গোসল করব। গোসল করে উঠে এসে দাড়ি গোঁফ কমাব। আইডিয়াটা কেমন ভাইজান?

আইডিয়া খারাপ না।

এখন তোমাকে জরুরি কথাটা বলি। জরুরি কথাটা হচ্ছে ফুলফুলিয়াকে তুমি ছবি দুটা দিয়ে আসবে। আমি যাব না। এখন আমার আর যেতে ইচ্ছা করছে না।

খামে ভরে বাইপোস্ট পাঠিয়ে দিলেও তো হয়।

না ভাইজান, তোমাকেই যেতে হবে। আমি তো জানতাম না মেয়েটা বিবাহিতা। গতকাল রাতে মার কাছ থেকে জেনেছি। কিন্তু তার আগেই একটা ভুল করে ফেলেছি। পরশু দুপুরে ফুলফুলিয়াকে একটা চিঠি লিখে পোষ্ট করেছি। বত্রিশ পৃষ্ঠার চিঠি। আমি চাই না। এই চিঠিটা সে পড়ুক।

বত্রিশ পৃষ্ঠার চিঠি লিখেছিস কষ্ট করে, আরো কয়েক পৃষ্ঠা লিখলে তো উপন্যাস হয়ে যেত।

আমিও পঞ্চাশ পৃষ্ঠা লিখব ঠিক করেছিলাম। এ4 সাইজ কাগজ শেষ হয়ে গেল। আমি যে-ধরনের চিঠি লিখেছি সে-ধরনের চিঠি লিখতে কষ্ট হয় না। দুই হাজার তিন হাজার পৃষ্ঠাও লেখা যায়। একটা বাক্যই বারবার লিখি–আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আমি বিড়বিড় করে বললাম, পবিত্র গাভী।

জহির বলল, চিঠি তোমাকে ফেরত নিয়ে আসতে হবে ভাইজান।

আমাকে গিয়ে ফুলফুলিয়াকে বলতে হবে যে, তোমার নামে আজ-কালের ভেতর একটা চিঠি আসবে। চিঠিটা তুমি না পড়েই নষ্ট করে ফেলবে।

ঠিক ধরেছ ভাইজান। এই কাজটা তোমাকে করতে হবে।

কোনো মেয়ের পক্ষে চিঠি না পড়ে নষ্ট করে ফেলা তো অসম্ভব ব্যাপার।

এই জন্যেই তো তোমাকে যেতে বলছি। তুমি বললেই অসম্ভব সম্ভব হবে। এই ক্ষমতা তোমার আছে।

আচ্ছা দেখি।

দেখাদেখি না। তুমি আজই যাবে এবং চিঠিটা না পড়ার কথা এমন ভাবে বলবে যেন সে চিঠি না পড়ে। একটা বিবাহিতা মেয়ে যখন দেখবে কেউ তাকে তখন তার ঘেন্না লাগবে। ভাইজান চিঠিটা ফেরত আনতে পারবে না?

চেষ্টা করব।

ভাইজান উঠি?

যা হাঁটা শুরু কর। খালি পায়ে না হেঁটে ভালো কেডস এর জুতা কিনে নে। আমি ঠিক করেছি খালি পায়েই হাঁটব। সঙ্গে টাকা-পয়সা কাপড় চোপড় কিছুই থাকবে না। ক্ষিধে লাগলে মানুষের বাড়ি গিয়ে খাওয়া চাইব। খেতে দিলে খাব। খেতে না দিলে খালি পেটেই হাঁটব। সন্ন্যাসীদের মতো জীবন।

নাগা সন্ন্যাসীদের মতো পুরোপুরি নগ্ন হয়ে তুই যদি হাঁটতে পারিস তাহলে কিন্তু খাওয়ার অভাব হবে না। একজন নগ্নমানুষ কোনো বাড়িতে খেতে চাইছে আপদ বিদেয়। করার জন্যেই তারা তাড়াতাড়ি খাবার দেবে। টাকা-পয়সা চাইলে টাকা-পয়সা দেবে।

নগ্ন হয়ে হাঁটতে পারব না ভাইজান, লজ্জা লাগবে।

লজ্জা লাগলে তো কিছু করার নেই। তোকে বুদ্ধি শিখিয়ে দিলাম। যদি দেখিস মহাবিপদে পড়ে গেছিস, খাওয়া জুটছে না— তখন নাগা সিস্টেম।

জহির উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম, শুভ দেশ হন্টন।

বিকেল তিনটায় খালু সাহেব চলে এলেন। তাঁর মুখ গভীর। কপালের চামড়া কুঁচকে আছে। চোখ ছোট ছোট। সুপ্ত অগ্নিগিরি টাইপ ভাব ভঙ্গি। বিস্ফোরণের আগে আগ্নেয়গিরি অতিরিক্ত শান্ত থাকে। খালু সাহেবও অতিরিক্ত শান্ত।

কেমন আছ হিমু?

জ্বি ভাল।

তোমাকে পাওয়া যাবে ভাবি নি। তুমি তো ঘরে বসে থাকার লোক না। শুয়ে আছ যে, শরীর খারাপ না-কি?

জ্বি না। শরীর ভালো।

অফিস থেকে বাসায় যাবার পথে ভাবলাম তোমার সঙ্গে বসে এক কাপ চ খেয়ে যাই। জহিরকে নিয়ে কিছু কথা ছিল। কথাও বলি।

আমি বিছানা থেকে নামতে নামতে বললাম— আমি চায়ের কথা বলে আসি।

খালু সাহেব বললেন, চায়ের কথা বলতে হবে না। আমি ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এসেছি। অফিসের পিওনের কাছে ফ্লাস্ক। কাপ আনতে ভুলে গেছি। ওকে দুটা মগ কিনতে পাঠিয়েছি।

আমার কাছে কাপ ছিল।

তোমারটা তোমার কাছে থাকুক। মগ দুটা তোমাকে দিয়ে যাব। অফিস ফেরত মাঝে মধ্যে যদি চা খেতে আসি মাগে করে চা খাওয়া যাবে।

আপনি কি প্রায়ই আসবেন?

খালু সাহেব আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চেয়ারে বসলেন। টেবিলে রাখা ফুলফুলিয়ার ছবি দুটা নিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

কার ছবি?

রবীন্দ্রনাথ এবং আইনস্টাইনের ছবি।

সে তো বুঝতেই পারছি। মেয়েটা কে?

ওর নাম ফুলফুলিয়া।

ফুলফুলিয়া? নামটা পরিচিত লাগছে কেন?

খালার কাছে তার নাম মনে হয় শুনেছেন।

ও আচ্ছা— দ্যাট ফুলি ফুলিয়া? রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের সঙ্গে তার ছবি কীভাবে এলো।

এটা ফটোগ্রাফিক ট্রিক। ফটোশপ নামের একটা কম্পিউটার প্রোগ্রামে এই কাজটা সহজেই করা যায়।

জহির করেছে?

জ্বি।

পড়াশোনা বাদ দিয়ে সে ট্রিক ফটোগ্রাফ করছে? তুমি নিশ্চয়ই জানো আজ সে পরীক্ষা দিতে যায় নি।

জানি। আমার কাছে এসেছিল।

তোমার কাছে যে আসবে এটা আমি ধরেই নিয়েছি।

খালু সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরালেন। তাঁর কপালের চামড়ায় আরেকটা ভাঁজ পড়ল। চোখ দুটা আরো ছোট হয়ে গেল। সুপ্ত আগ্নেয়গিরি এখন গা ঝাড়া দিচ্ছে। যে-কোনো সময় লাভা বের হতে শুরু করবে। খালু সাহেবের পিওন দুটা মগ এবং ফ্লাস্ক নিয়ে ঢুকেছে। লোকটা অতি দ্রুত মাগে চা ঢেলে দিল। সে চায়ের সঙ্গে কেকও এনেছে। এক বাক্স টিসু পেপার এনেছে। টিসু পেপার, কেক রেখে অতিদ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। মনে হয় তার ওপর এ রকম নির্দেশই ছিল।

হিমু।

জ্বি।

জহিরের পরিকল্পনা কী তা তুমি জানো?

জানি। আমাকে বলে গেছে। আপাতত সে হাঁটবে।

হাঁটবে মানে?

প্রথমে যাবে তেতুলিয়া, সেখান থেকে হাঁটা শুরু করবে। হাঁটা বন্ধ হবে শাহপরী দ্বীপে। শাহপরী দ্বীপ হলো বাংলাদেশের শেষ সীমানা। শাহপরী দ্বীপে পৌঁছার পর সে সমুদ্র স্নান করবে। দাড়ি কামাবে।

দাড়ি কামাবে মানে?

এই কদিন সে দাড়ি গোঁফ কামবে না। ছয় মাসে দাড়ি গোঁফ অনেক বড় হয়ে যাবে। কামানো ছাড়া গতি কী?

সে ছয় মাস ধরে হাটবে। এটাই তার পরিকল্পনা?

জ্বি।

সে যে বর্তমানে মানসিক রোগী এটা কি সে জানে?

জ্বি না জানে না। মানসিক রোগী কখনোই বুঝতে পারে না যে সে মানসিক রোগী।

তোমাকে যখন সে তার পরিকল্পনার কথা বলল, তখন তুমি তাকে কী বললে?

আমি তাকে ভালো কেডস জুতা কিনতে বললাম। খাওয়া দাওয়ার সমস্যা যদি হয়। তখন একটা বুদ্ধি বলে দিয়েছি। এই বুদ্ধিমতো কাজ করলে খাওয়া দাওয়ার সমস্যা হবে না। যে-কোনো বাড়িতে খাবার চাইলেই খাবার দেবে।

কী বুদ্ধি?

খালু সাহেব সেটা আপনাকে বলব না। বললে আপনি রাগ করতে পারেন।

রাগ করব না, বলো। আমি হতভম্ব অবস্থায় আছি। হতভম্ব মানুষ রাগ করতে পারে না।

আমি জহিরকে বলেছি। যদি সে দেখে কেউ তাকে খেতে দিচ্ছে না। তাহলে সে যেন নাগা সন্ন্যাসী টাইপ হয়ে যায়। কাপড় চোপড় সব খুলে ফেলে পুরো নগ্ন হয়ে যাওয়া।

শুধু পায়ে থাকবে কেডস জুতা। এই অবস্থায় কোনো বাড়িতে খাবার চাইলে অবশ্যই খাবার দেবে।

খালু সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিছু বলছেন না। হাত বাড়িয়ে চায়ের মগ নিয়ে মাগে চুমুক দিলেন। সিগারেট ধরলেন। আমি নিজেই মাগে চুমুক দিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, চা-টা খুবই ভালো হয়েছে। খালু সাহেবের ঠোঁটের কোণায় রহস্যময় হাসি দেখা গেল।

হিমু!

জ্বি।

তুমি তাকে নেংটো হয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি খাবার ভিক্ষা করে খেতে বলেছ?

তেমন ইমার্জেন্সি যদি হয় তাহলেই এই পথে যেতে বলেছি। তবে সে যাবে না। সে বলেছে তার লজ্জা করে।

তুমি একটা কথা বলবে। আর তা সে করবে না এটা কখনো হবে না। ঠিকই সে নেংটো হয়ে পথে পথে হাঁটবে। হিমু শোন, আমার ধারণা— না ধারণা না আমার দৃঢ় বিশ্বাস পুরো ব্যাপারটার আর্কিটেক্ট হচ্ছে তুমি। কফির দোকান, ফুলফুলিয়া, পরীক্ষা না। দেয়া, নেংটো হয়ে হাঁটাহাঁটি সব কিছুর মূলে আছ তুমি। আমার ছেলে গোল্লায় গেছে যাক–আমি তোমাকে ছাড়ব না। আমি তোমার হিমুগিরি বের করে দেব। তোমার খালা তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। তোমাকে আমি চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর তুমি আমার ছেলেকে আমার সামনে হাজির করবে। যদি করতে পার তাহলেই তোমাকে ক্ষমা করব। আর নয়তো না।

খালু সাহেব সময় আরেকটু বাড়ানো যায় না? বাহাত্তর ঘণ্টা করা যায়?

চব্বিশ ঘণ্টা মানে চব্বিশ ঘণ্টা। এখন বাজে দুটা একুশ। আমি আগামীকাল দুটা একুশে তোমার এখানে আসব। তখন যেন জহিরকে দেখতে পাই।

খালু সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

আমি বললাম, জহির কোথায় আছে আমি জানি না। আমাকে চেষ্টা করতে হবে। টেলিপ্যাথিক পদ্ধতিতে। একটু সময় তো লাগবেই।

খালু সাহেব আগুন কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এখন ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন। রাগ সামলাবার চেষ্টা। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। স্ট্রোক ফোক না। হয়ে যায়। আমি বললাম, চলুন আপনাকে গাড়ি পর্যন্ত দিয়ে আসি।

ধন্যবাদ। তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে না। I know the way.

খালু সাহেবের রাগ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। রাগ এবং টেনশনের সময় তিনি বাংলা ভুলে যান। তাঁকে আর ঘাটানো ঠিক হবে না। আমিও খালু সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, এখন বসে পড়লাম। আমার হাতে চব্বিশ ঘণ্টা সময়। এই চব্বিশ ঘণ্টায় কিছু করা যাবে না। ফুলফুলিয়ার কাছ থেকে অবশ্যি টেলিপ্যাথিক পদ্ধতিতে মানুষকে ডাকার কৌশল শিখে আসা যায়। খালার সঙ্গেও কথা বলা দরকার। খালার বাসায় যাবার প্রশ্নই উঠে না। কথা বলার কাজটা সারতে হবে টেলিফোনে। কোনটা আগে করব বুঝতে পারছি না খালার সঙ্গে কথা বলব, না ফুলফুলিয়ার সঙ্গে দেখা করব? আশ্চর্য ব্যাপার খালু সাহেব এখনো দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হচ্ছে বিশেষ কোনো কথা বলতে চান। কথা বলাটা ঠিক হবে কিনা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। আমি বললাম, খালু সাহেব কিছু বলবেন?

চব্বিশ ঘণ্টা যাক তারপর যা বলার বলব।

খালু সাহেব দরজার দিকে রওনা হলেন। ফ্লাস্কটা ফেলে যাচ্ছেন। নিয়ে যেতে হবে। বলব কিনা বুঝতে পারছি না। বললে হয়তো আরো রেগে যাবেন। থাকুক ফ্লাস্ক। দেখেই বোঝা যাচ্ছে দামি জিনিস। বরং এক কাজ করা যেতে পারে, ফ্লাস্ক ভর্তি চা নিয়ে ফুলফুলিয়ার সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে। ঐ দিন তাঁর গরম রুটিগুলো ভালো ছিল। চা ভালো ছিল না।

কলিং বেলে হাত রাখার আগেই দরজা খুলে গেল এবং দরজা পুরোপুরি খোলার আগেই ফুলফুলিয়া বলল, ভাইজান আসুন। চমৎকৃত হবার মতো ঘটনা। দরজায় কোনো পিপ হোল নেই যে ফুলফুলিয়া আগে থেকে দেখবে আমি এসেছি। যেহেতু চমৎকৃত হবার ব্যাপারটা আমার মধ্যে নেই, আমি চমৎকৃত হলাম না। খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, কেমন আছ?

ফুলফুলিয়া বলল, ভালো।

তোমার দুটা ছবি আছে আমার কাছে। ছবি দুটা দিতে এসেছি।

ফুলফুলিয়া বলল, রবীন্দ্রনাথ এবং আইনস্টাইনের সঙ্গে ছবি?

তুমি ব্যাপারটা জানো না-কি?

উনি বলেছেন। উনি আসলে হঠাৎ করে ছবি দেখিয়ে আমাকে বিস্মিত করতে চেয়েছিলেন। পেটে কথা রাখতে পারেন নি। আগেই বলে দিয়েছেন। ভাইজান শুনুন, আমার বাবা বাসায় আছেন। উনার শরীর সামান্য খারাপ। আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে কিছু মনে করবেন না।

উনি কি সব সময় খারাপ ব্যবহার করেন?

কী করলে উনি খুশি হন?

কোনো কিছুতেই খুশি হন না। তবে তার ব্যাঞ্জো বাজনার প্রশংসা করলে তিনি মনে মনে খুশি হন।

কী বাজনা বললে–ব্যাঞ্জো?

জ্বি।

চল, তোমার বাবার কাছে আমাকে নিয়ে চল। উনার নাম কী?

শমসের উদ্দিন।

খাটের ওপর এই গরমের ভেতর কথা গায়ে দিয়ে জবুথবু হয়ে এক বৃদ্ধ বসে। আছে। নেশাগ্রস্ত মানুষের লাল চোখ। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কিছু মানুষ আছে সপ্তাহে একদিন শেভ করেন। উনি মনে হয় সেই দলের। ভদ্রলোকের মুখ ভর্তি দাড় গোঁফের জঙ্গল থাকলেও মাথা চুল শূন্য। টাক মাথা মানুষেরও কিছু চুল থাকে। উনার তাও নেই। তবে তার টাকে বিশেষত্ব আছে। টাকা চকচক করছে না। ম্যাট ফিনিশিং। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে খ্যাক খ্যাক করে উঠলেন।

আপনে কে?

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, আমার নাম হিমু।

চান কী?

বসে তারপর বলি। বসতে পারি?

শমসের উদ্দিন লাল চোখে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন। আমার দিকে না। তাঁর মেয়ের দিকে। আমি ফুলফুলিয়াকে বললাম, এই মেয়ে তুমি আমাদের দুজনকে চা দাও। আমি ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এসেছি। চা খেতে খেতে আমি তোমার বাবার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা বলি। জরুরি কথা বলার সময় তোমার না থাকাই ভালো।

শমসের উদ্দিন আমার দিকে ফিরলেন। আগের মতোই খ্যাক খ্যাক করে বললেন, মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসছেন? এই এক যন্ত্রণায় পড়েছি। দুই দিন পরে পরে যন্ত্রণা। বাংলাদেশে মনে হয় বিবাহযোগ্য মেয়ে এই একটা। প্রস্তাব দেয়ার আগে শুনে রাখেন— আমার মেয়ের দুই বছর আগে বিবাহ হয়েছে। জামাই পোষ্টমাস্টার।

এটা কোনো ব্যাপার না?

কী বললেন, এটা কোনো ব্যাপার না?

জ্বি না। মোঘল ইতিহাস পড়লে দেখবেন মোঘল সম্রাটদের কোনো একটা মেয়েকে পছন্দ হলো। দেখা গেল সেই মেয়ে বিবাহিতা। কোনো অসুবিধা নেই। হাসবেন্ড মেরে ফেলা। নতুন করে বিয়ের ব্যবস্থা কর।

চুপ!

আমাকে চুপ করতে বলছেন?

হ্যাঁ চুপ। আর কোনো কথা না। এখন গেট আউট। এই মুহূর্তে গেট আউট।

আসল কথাটা তো এখনো বলতে পারি নি।

আসল কথা নকল কথা কোনো কথা না। তুমি ভদ্রলোকের ছেলে। মারধোর করব না। মানে মানে বের হয়ে যাও।

আপনার ব্যাঞ্জো বাজনা বিষয়ে কথা বলতে এসেছিলাম। আপনার মেয়ের বিবাহের বিষয়ে না। মোঘল সাম্রাজ্যও তো এখন নাই যে স্বামী খুন করে আবার বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

ব্যাঞ্জো বিষয়ে তোমার কী কথা?

একটা সিডি কোম্পানি আপনার ব্যাঞ্জো নিয়ে সিডি বের করতে চায়। আমি তাদের এজেন্ট। এই বিষয়ে কথা বলতে এসেছি।

আমার ব্যাঞ্জো বাজনার সিডি বের করতে চায়?

জ্বি।

তুমি আমার নাম জানো?

নাম কেন জানব না? আপনি হলেন ওস্তাদ শমসের উদ্দিন খাঁ।

খাঁ পেলে কোথায়? নামের শেষে খাঁ নাই।

খাঁ নাই, এখন লাগায়ে দিব। ওস্তাদের নামের শেষে খাঁ না থাকলে মানায় না। আপনি আগ্রহী হলে বলেন। টার্মস এন্ড কন্ডিশন ঠিক করি।

আমার ব্যাঞ্জো বাজনা তুমি শুনেছ?

আমি শুনি নি। শোনার ইচ্ছাও নাই। গান বাজনা আমার পছন্দের জিনিস না। আমি এজেন্ট। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে, করলাম। বাকি আপনার ইচ্ছ। শুনেছি ব্যাঞ্জো যন্ত্রটা আজকাল বাজানো হয় না। লোকজন এই যন্ত্রটার কথা ভুলেই গেছে। আর আপনি নাকি মোটামুটি বাজাতে পারেন।

মোটামুটি বাজাই? আমি মোটামুটি বাজাই? আমি মোটামুটি বাজালে সিডি কোম্পানি তোমাকে আমার কাছে পাঠাতো সিডি বের করার জন্য? এরা তো তোমার মত ঘাস খায় না।

তাও ঠিক। আপনি কি রাজি?

ফট করে রাজি অরাজি কী? জিনিসটা ভালো মতো বুঝে নেই। চা খাও। কী ধরনের বাজনা এরা চায়? রাগ প্রধান?

সেটা আপনার ইচ্ছা। রাগ-প্রধান বাজাতে চাইলে রাগ-প্রধান বাজাবেন। ভালোবাসা-প্রধান বাজাতে চাইলে ভালোবাসা-প্রধান বাজাবেন।

ভালোবাসা-প্রধান কী?

আপনারা সঙ্গীতের লোক। আপনারা জানবেন ভালোবাসা-প্রধান কী?

তুমি তো দেখি গান বাজনা লাইনের কিছুই জানো না।

আগেই তো বলেছি কিছু জানি না। আপনি কী বাজাবেন আপনি ঠিক করুন। আপনার সঙ্গে কি তবলা ফ বলা লাগবে?

ফবলা কী? এইভাবে কথা আমার সঙ্গে বলবে না।

জ্বি আচ্ছা বলব না।

শমসের উদ্দিন সাহেবের চোখ মুখ কোমল হয়ে গেল। তিনি এই প্রথম স্নেহ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার নাম কী?

হিমু।

ভালো নাম কী?

ভালো নাম, খারাপ নোম একটাই— হিমু।

সত্যি সত্যি ব্যাঞ্জোর সিডি বের করবে?

অবশ্যই।

এই উপমহাদেশে আমার চেয়ে ভালো ব্যাঞ্জো কেউ বাজায় না। এটা জানো?

জ্বি না।

তোমাকে তুমি তুমি করে বলছি, মনে কিছু নিও না।

আপনি ওস্তাদ মানুষ আপনি তো তুমি তুমি করে বলবেনই। তাহলে কথাবার্তা ফাইন্যাল?

শমসের উদ্দিন নিজের মনে বিড়বিড় করে বললেন, বত্রিশ মাত্রা, সঙ্গে তেহাই— রাগ কাফি যখন ধরব ঝড় তুলে দিব। ব্যাঞ্জোর উপর দিয়ে যখন আঙুল চলবে। আঙুল দেখা যাবে না। যদি আঙুল দেখা যায়–আল্লাহর কীরা আঙুল কেটে তোমাকে দিয়ে দিব।

কাটা আঙুল দিয়ে আমি কী করব?

তুমি আঙুল কেটে কী করবে। সেটা তোমার বিবেচনা। আমার আঙুল কেটে দেয়ার কথা আমি দিলাম।

ধন্যবাদ!

তোমার নামটা যেন কী আরেকবার বলো তো। মিহি? আজকাল মানুষের নাম মনে থাকে না।

আমার নাম হিমু। তবে আপনার যদি মিহি ডাকতে ইচ্ছা হয় ডাকবেন।

রাতে আমার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করি। আজ বাসায় মাংস রান্না হবে। ঝোল দিয়ে গো মাংস, সঙ্গে চালের আটার রুটি। রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাংসের ঝোলের মধ্যে ফেলবে। রুটি নরম হবে। মুখের মধ্যে ফেলবে। আর গিলে ফেলবে।

কবুল।

কবুল মানে কী?

কবুল মানে আমি রাজি।

খাওয়া দাওয়ার পরে রাগ কাফির একটা বন্দীশ শোনাব। তিন তাল শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

মাথা তো আমার এমনিতেই খারাপ হয়ে আছে। দিন আরো খারাপ করে।

ঠিক করে বলো তো চালের আটার রুটি করবে না পোলাও রাধবে? অনেক দিন পোলাও খাই না। দরিদ্র মানুষ, ইচ্ছা করলেও সম্ভব হয় না।

আপনার কি পোলাও খেতে ইচ্ছা করছে?

তুমি মেহমান মানুষ এই জন্যে বলছি। আর ফুলফুলিয়া সে-রকম ভালো রাধাতেও পারে না। আমার স্ত্রী পারতেন। আফসোস তার হাতের পোলাও তোমাকে খাওয়াতে পারলাম না।

উনি কোরমা কেমন রাঁধতেন?

কোরমার কথা বলে দিলে তো মনটা খারাপ করে। শহরের লোকজন তো কোরমা রাঁধতেই পারে না। মুরগির রোস্ট, দোপেয়াজা, ঝালফ্রাই। বাঙালি কোরমার কাছে কিছু লাগে? তোমার কি কোরমা খেতে ইচ্ছা করছে?

জ্বি। আপনার কি করছে?

আমার তো মুখে পানি চলে আসছে। বয়স হয়েছে তো, সুখাদ্যের কথা মনে হলে মুখে পানি চলে আসে। সামলাতে পারি না। দেখি ব্যবস্থা করা যায় কি না।

ফুলফুলিয়া এতক্ষণ পরে চা নিয়ে ঢুকেছে। তার দেরির কারণ বোঝা যাচ্ছে। সিঙ্গাড়া ভেজে এনেছে।

শমসের উদ্দিন মেয়ের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, পোলাও রাধার ব্যবস্থা কর। পোলাও, মুরগির কোরমা, গরুর ঝাল মাংস। মিহি রাতে খাবে।

ফুলফুলিয়া বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। শমসের উদ্দিন বিরক্ত গলায় মেয়েকে বললেন, হা করে তাকিয়ে থাকিস না তো— রান্নাবান্নার জোগাড় কর। টক দৈ এর ব্যবস্থা রাখিস। গুরু ভোজনের পরে টক দৈ। হজমের সহায়ক।

ফুলফুলিয়া ঘর থেকে বের হতেই শমসের উদ্দিন আমার দিকে ঝুকে এসে গলা নামিয়ে বললেন, মিহি এই যে আমার ব্যাঞ্জোর সিডি বের হচ্ছে। কেন বের হচ্ছে জানো?

আমি বললাম, না।

শমসের উদ্দিন বললেন, গত মাসে সিলেটে গিয়েছিলাম। শাহজালাল সাহেবের দরগায় গিয়ে কান্নাকাটি করেছি। বলেছি আমার বড় শখ আমার বাজনা দেশের মানুষকে শোনাই। আল্লাহপাক, শাহজালাল সাবের উছিলায় তুমি বান্দার মনের বাসনা পূর্ণ করা। আল্লাহপাক যে তখনই মঞ্জুর করে দিয়েছেন বুঝতে পারি নাই। এখন বুঝলাম। ঠিক করেছি। গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে দুরাকাত শোকরানা নামাজ পড়ব। মিহি, তুমি ফুলফুলিয়াকে বলো গোসলের জন্যে গরম পানি করতে। যাও রান্নাঘরে চলে যাও। কোনো অসুবিধা নাই। আমার এই বাড়ি এখন থেকে তুমি নিজের বাড়ি মনে করবে।

আমি রান্নাঘরে চলে এলাম। ফুলফুলিয়া কুলায় চাল বাছছিল। আমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখে মোটেই অবাক হলো না। শুধু বলল, সব মানুষকেই কি আপনি মুহুর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় নিতে পারেন? আমাকে পারবেন?

আমি তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম, গরম পানি করা তো। খাঁ সাহেব গোসল করবেন।

ফুলফুলিয়া বলল, খাঁ সাহেব কে?

তোমার বাবা।

ও আচ্ছা।

আমি হাসিমুখে বললাম, আরেকটা জরুরি কথা। জহির তোমাকে একটা চিঠি লিখেছে। পোষ্ট করেছে। এক দুদিনের মধ্যে চিঠিটা তোমার হাতে চলে আসবে। চিঠি তুলে রাখবে। এখন পড়বে না। যখন আমি তোমাকে পড়তে বলব। তখন পড়বে। ঠিক আছে?

ফুলফুলিয়া বেশ কিছুক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর চোখ নামিয়ে শান্ত গলায় বলল, ঠিক আছে।

ব্যাঞ্জোর আসর বসল। রাত বারোটায়। বাড়িওয়ালা না ঘুমানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। দরজা-জানালা বন্ধ করতে হলো যেন শব্দ বাইরে না যায়।

বাজনা শুরু হলো। আমি চমকে উঠলাম— এ-কী? মনে হচ্ছে বাজনার তালে তালে। বাতাস কাঁপতে শুরু করেছে। শুধু বাতাস না, এখন মনে হচ্ছে ঘরবাড়ি দুলছে। বুকের ভেতরের হৃৎপিণ্ড দুলছে। এ যেন অলৌকিক অপার্থিব সঙ্গীতের ঝড়। আমি ভদ্রলোকের আঙুলের দিকে তাকালাম। আঙুল সত্যি সত্যি দেখা যাচ্ছে না। যে-কোনো মহৎ সঙ্গীত বুকের ভেতরে তীব্র বেদনা তৈরি করে। আমার সে-রকম হচ্ছে। বুক টনটন করছে।

এক সময় বাজনা থামল। আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললাম, দেখি আপনার পা-টা একটু এগিয়ে দিন তো। আপনার পায়ের ধুলা কপালে মাখব।

আমি হাত বাড়িয়ে দিতেই ভদ্রলোক দুহাতে আমার হাত ঝাপ্টে ধরে তাঁর বুকে লাগালেন এবং ব্যাকুল হয়ে শিশুদের মতো শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন।

৪. ওপাশ থেকে যে টেলিফোন ধরেছে

ওপাশ থেকে যে টেলিফোন ধরেছে তার গলা আমি চিনতে পারছি না। প্রচুর চিৎকার চোঁচামেচির পর গলা ভেঙে গেলে যে আওয়াজ বের হয়। সে রকম আওয়াজ হচ্ছে। গলাটা পুরুষের না মহিলার তাও বুঝতে পারছি না। আন্দাজের ওপর বললাম, মাজেদা খালা?

হুঁ।

ফজলামি করবি না।

ঘটনা কী?

জানি না ঘটনা কী। তুই কোথায়?

এই মুহুর্তে আমি একটা টেলিফোনের দোকানে।

মেস ছেড়ে দিয়েছিস?

হ্যাঁ। খালু সাহেব জহিরের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টায় কিছু করতে পারি নি। কাজেই ভাবলাম পালিয়ে যাওয়াই ভালো। যা পলায়তি স জীবতি।

আমার সঙ্গে সংস্কৃত কপচাবি না। তোর নামে পুলিশের ওয়ারেন্ট বের হয়েছে।

বলো কী?

তোর খালু খুবই রেগেছে। তার বন্ধু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব। সে তাকে বলে এই কাজটা করিয়েছে।

চার্জ কী? আমি অপরাধটা কী করেছি?

জানি না চার্জ কী! তুই পালিয়ে থাক, সেটাই ভালো। এদিকে তোর খালুকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা আমি চালিয়ে যাচ্ছি।

আমাকে জেলে না ঢুকানো পর্যন্ত খালু ঠাণ্ডা হবেন বলে মনে হচ্ছে না।

আমার ওপর তার অনেক দিনের রাগ। প্রাচীন কাল হলে দ্বন্দ যুদ্ধে আহবান করতেন। একালে তো আর এটা সম্ভব না। এখন আসল কথা বলো–জহিরের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হয়েছে?

হয়েছে। তেতুলিয়া রওনা হবার আগে টেলিফোন করেছিল।

তেতুলিয়া রওনা হয়ে গেছে?

হুঁ।

তেতুলিয়া থানার ওসি সাহেবের কাছে জহিরের ছবি দিয়ে লোক পাঠানো হয়েছে। জহিরকে দেখলেই সে এরেস্ট করবে। আচ্ছা হিমু শোন, তোর খালু সাহেব বলছিল তুই নাকি

জহিরকে বুদ্ধি দিয়েছিস তেতুলিয়া থেকে সে যেন নেংটো হয়ে হাঁটা ধরে। এমন ভয়ঙ্কর পরামর্শ তুই কীভাবে দিলি? তোর খালু যে তোকে জেলে ঢুকাতে চায় শুধু শুধু তো ঢুকাতে চায় না। আমার নিজেরও ধারণা তোকে অন্তত কিছুদিনের জন্যে হলেও সোসাইটি থেকে দূরে রাখা উচিত। তুই উপদ্রবের মতো।

খালা তোমার ভাঙা গলা ঠিক হয়ে যাচ্ছে। এখন পরিষ্কার আওয়াজ আসছে।

হিমু তুই কথা ঘুরাবার চেষ্টা করছিস। আমার গলা আগে যেমন ছিল এখনো সেরকমই আছে।

তাহলে মনে হয় ফ্যাসফ্যাসে গলা শুনে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। যাই হোক আগে কাজের কথা সেরে নেই।

তোর আবার কাজের কথা কী?

কাজের কথা তো বেকারদেরই জিনিস। যারা বেকার না তাদের হলো কাজ। কাজের কথা বলে তাদের আলাদা কিছু নেই।

কথা পেচাবি না, আমার খুবই বিরক্তি লাগে। কী বলতে চাচ্ছিস বল।

ওস্তাদ শমসের উদ্দিন খাঁ সাহেব তোমাকে সালাম জানিয়েছেন।

কে?

ওস্তাদ শমসের উদ্দিন খাঁ। উপমহাদেশের প্রখ্যাত ব্যাঞ্জো বাদক। ব্যাঞ্জো জগতের রাজা। তাকে আমরা আদর করে ব্যাঞ্জো-রাজও বলতে পারি।

কী বলছিস তুই আবোলতাবোল?

ব্যাঞ্জো-রাজ ওস্তাদ শমসের উদ্দিন খাঁ সাহেবকে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে তোমার সঙ্গে চা খেতে রাজি করিয়েছি। তিনি অটোগ্রাফ দেবেন এবং ছবি তুলতেও দেবেন। তবে জাস্ট একবার। তুমি পুরো এক রোল ছবি তাকে নিয়ে তুলবে তা হবে না। উনার এত ধৈর্য নেই। খুবই খিটখিটে স্বভাবের মানুষ। খালা, আমি তোমার ভাগ্য দেখে রীতিমতো ঈর্ষান্বিত।

ভ্যাজর ভ্যাজর না করে আসল ঘটনা বল। খুবই বিরক্ত লাগছে। ওস্তাদ শমসের উদ্দিন খাঁ কে?

একটু আগে না বললাম— এই উপমহাদেশের জীবন্ত ব্যাঞ্জো কিংবদন্তি।

আমার সঙ্গে তার কী? তাঁর নামও কোনোদিন শুনি নি। চোখেও দেখি নি।

তার নাম না শুনলেও অবশ্যই তাকে দেখেছি। তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে।

কোথায় দেখা হয়েছে?

ভূমিকম্পের রাতে। উনি তোমার মশারির ভেতর ঘাপটি মেরে বসেছিলেন। মনে করে দেখ। টাক মাথা বুড়ো। হিজ মাস্টার্স ভয়েসের কুকুরের মতো বসন্তি মানে বসা।

কী বলছিস হাবিজাবি? তোর কি মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে?

তুমি ভুলে গেছ ভূমিকম্পের রাতে তোমার খাটের ওপর মশারি ফেলে ঘাপটি মেরে এক বুড়ো বসে ছিল না? উনিই ওস্তাদ শমসের উদ্দিন খাঁ সাহেব। ব্যাঞ্জো জগতে অপবিত্র অবস্থায় তার নাম নেয়া পর্যন্ত নিষেধ।

হিমু শোন, ঐ রাতে ভয়ে আর টেনশনে মাথা ছিল এলোমেলো। চোখে ধান্ধার মতো লেগেছে।

ধান্ধা ফান্ধা কিছু না, যা দেখেছি ঠিকই দেখেছি। বুড়োর মাথায় কোনো চুল ছিল না। মাথা ভর্তি টাকা। ঠিক না?

তা ঠিক।

গায়ের রঙ দুধে আলতায়?

মনে পড়ছে না।

মনে করে দেখ।

হ্যাঁ ফর্সাই, পায়ের পাতা দেখা যাচ্ছিল। ফর্সা পা। লম্বা। বাঁশপাতার মতো লম্বা।

পয়েন্টে পয়েন্টে মিলে যাচ্ছে। তুমি মহা ভাগ্যবতী। খাঁ সাহেবকেই দেখেছি।

উনাকে কেন দেখাব?

উনাকে কেন দেখবে তা তো বলতে পারছি না। কোনো একটা খেলা হচ্ছে। তুমি এবং খাঁ সাহেব তোমরা দুজনই খেলার পুতুল।

হিমু, তোর কথাবার্তা শুনে কেমন জানি লাগছে।

উনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও?

কী জিজ্ঞেস করব?

কঠিন গলায় চার্জ করতে পোর। জিজ্ঞেস করতে পোর— ভূমিকম্পের রাতে আপনি কী মনে করে আমার শোবার ঘরের খাটে বসেছিলেন? দেখি ব্যাটা কী বলে। ওস্তাদ হোক আর যাই হোক এত সহজে তো আমরা তাকে ছাড়ব না।

তুই এমনভাবে বলছিস যেন ঘটনাটা সত্যি ঘটেছে।

অবশ্যই ঘটেছে। আর না ঘটলেও সুষ্ঠ। তদন্ত হওয়া দরকার না? আসামি যখন হাতের কাছে আছে।

আসামি বলছিস কেন? উনি নিশ্চয়ই জানেন না যে উনি আমার খাটে বসেছিলেন।

তদন্ত কমিশনে এইসব প্রশ্নই জিজ্ঞেস করা হবে।

নিতান্ত অপরিচিত একজন মানুষকে এ ধরনের প্রশ্ন করবি কীভাবে?

অপরিচিত মানুষকে আগে পরিচিত করে নেব। বাসায় ডেকে একদিন চা খাওয়াব।

বাসায় ডাকতে উপলক্ষ লাগবে না?

উপলক্ষ একটা কিছু তৈরি করব। উনাকে বলব— মাজেদা সঙ্গীত বিতানের ডিরেক্টর মিসেস মাজেদা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান। উনি খুবই খুশি হবেন যদি আপনি তাঁর সঙ্গে এককাপ চা খান।

মাজেদা সঙ্গীত বিতানটা কী?

এটা একটা সিডি কোম্পানি। এরা প্রতিভাধর সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীত সংগ্রহ করে। দেশে বিদেশে প্রচার করে। এই একাডেমী শুদ্ধ সঙ্গীতের প্রসার চায়।

একটা লোককে মিথ্যা কথা বলে নিয়ে আসবি? সত্য উদঘাটনের জন্যেই আমাদের মিথ্যার ভিতর দিয়ে যেতে হবে, উপায় কী? উনাকে বলব, মাজেদা সঙ্গীত একাডেমী আপনার একটা সিডি প্রকাশ করতে চায়। চা খেতে খেতে টার্মস এন্ড কন্ডিশন্স নিয়ে একাডেমীর ডিরেক্টর মিসেস মাজেদা কথা বলবেন।

তারপর উনি যখন দেখবেন সবই ভুয়া, তখন কী হবে?

সবই ভুয়া হবে কেন? প্রয়োজনে আমরা উনার একটা সিডি বের করব। কত টাকা আর লাগবে! খালু সাহেব তো বিপথে প্রচুর টাকা কামাচ্ছেন। সেই টাকা যত নষ্ট করা যায় ততই ভালো। খালা কী বলো, ভদ্রলোককে বলব। চা খেতে?

সিডি বের করতে কত টাকা লাগে?

আমি কিছুই জানি না। খোঁজ নেব। তার আগে আমরা মাজেদা সঙ্গীত একাডেমী গঠন করে ফেলি। ট্রেড লাইসেন্স বের করি। সিডি যদি ভালো চলে ঘরে বসে ব্যবসা। আমি দোকানে দোকানে সিডি দিয়ে আসব। মাসের শেষে টাকা নিয়ে আসব।

তোর খালু শুনলে রাগ করবে।

রাগ করার কিছু নেই। এটা তোমার বাতেনি ব্যবসা।

বাতেনি মানে কী? বাতেনি মানে গোপন, অপ্রকাশ্য। সঙ্গীত হবে তোমার গোপন ব্যবসা। রাজি?

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। মাথা আউল লাগছে। তোর যা ভালো মনে হয়। করা। তোর খালুর সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

তুমি পরামর্শ করতে যেও না। পরামর্শ যা করার আমি করব।

তুই কথা বলতে যাবি না। তোর ওপর সে ভয়ঙ্কর রেগে আছে। বললাম না, কেইস করেছে। তোর নামে ওয়ারেন্ট বের হয়ে গেছে। তোকে যে-কোনো দিন পুলিশ ধরবে।

ধরলে ধরুক। আপাতত আমি খালু সাহেবকে ধরব। উনার গোপন মোবাইল নাম্বারটা আমাকে দাও তো। ভয় নেই, আমি নাম্বার কোত্থেকে পেয়েছি বলব না।

খালার কাছ থেকে মোবাইল নাম্বার নিয়ে আমি খালু সাহেবকে টেলিফোন করলাম। মাইডিয়ার টাইপ গলার আওয়াজে বললাম, খালু সাহেব কেমন আছেন?

খালু সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, কে?

আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, হিমু কথা বলছি। আপনার শরীর ভালো?

তুমি কোথায়?

খালু সাহেব, আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। শুনেছি আপনি আমার নামে কেইস করেছেন। পুলিশ ওয়ারেন্ট নিয়ে আমাকে খুঁজছে। পালিয়ে থাকা ছাড়া গতি কী?

জহিরের খবর কিছু পেয়েছ?

জ্বি না।

তোমার সঙ্গে যোগাযোগ নেই?

জ্বি না।

মিথ্যা কথা বলছ কেন? তোমার সঙ্গে তার ভালোই যোগাযোগ আছে। আমি নিশ্চিত তোমরা দুজন। একই জায়গায় বাস করছি।

কোনো বিষয়েই এত নিশ্চিত হওয়া ঠিক না খালু সাহেব। গ্যালিলিও যখন প্রথম বললেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে তখনো তিনি আপনার মতো নিশ্চিত ছিলেন না। কিছুটা সন্দেহ তারও ছিল।

হিমু তুমি বেশি জ্ঞানী হয়ে গেছ। তোমার জ্ঞান কমাবার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যথাসময়ে তা বুঝতে পারবে।

জ্বি আচ্ছা খালু সাহেব। আপনাকে একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করার ছিল। আপনার মুড কি এখন ভালো? কথাটা মুড ভালো হলেই জিজ্ঞেস করব।

আমার মুড নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। যা জিজ্ঞেস করতে চাও করা।

ট্রেড লাইসেন্স করার ব্যাপারে কি আপনি সাহায্য করতে পারবেন? অতি দ্রুত আমাদের একটা ট্রেড লাইসেন্স বের করতে হবে। মাজেদা সঙ্গীত বিতানের নামে লাইসেন্স। লিমিটেড কোম্পানি হবে। মাজেদা খালা কোম্পানির ডিরেক্টর।

কী বললে?

মাজেদা সঙ্গীত বিতান শুদ্ধ সঙ্গীতের প্রসারের জন্যে কাজ করবে। কোম্পানির

প্রথম অবদান ওস্তাদ শমসের উদ্দিন খাঁর ব্যাঞ্জোর সিডি।

তোমার খালা সঙ্গীত বিতান করছে? সিডি বের করছে?

জ্বি।

তার একমাত্র ছেলে নেংটো হয়ে পথে পথে ঘোরার পরিকল্পনা করছে। আর সে কোম্পানি ফাঁদছে?

গান বাজনা নিয়ে ব্যক্তিগত দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা। দেবদাস মদের বোতল নিয়ে দুঃখ ভুলার চেষ্টা করেছেন। খালার পক্ষে তো আর সেটা সম্ভব না।

সিডি কোম্পানি ফাদার বুদ্ধি তুমি তার মাথায় ঢুকিয়েছ?

ঢোকানো বলতে যা বোঝায় তা না। তবে আইডিয়াটা নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছি।

তুমি তার মাথায় সিডির আইডিয়া ঢুকিয়ে দিলে? তুমি যে কত বড় বদমাশ এটা জানো? You play with human mind. এই খেলা আমি বন্ধ করতে যাচ্ছি। তুমি Unfit for the society. সোসাইটি থেকে দীর্ঘ দিনের জন্য তোমাকে দূরে রাখার ব্যবস্থা আমি করছি –I have to be cruel only to be kind. কথা শেকসপিয়রের তবে এই মুহূর্তে কথাটা আমারও।

খালু সাহেব, শেকসপিয়র একটা ভুল কথা বললে সেই ভুল কথা নিয়ে মাতামাতি করতে হবে? Kind হবার জন্যে Cruel হতে হবে কেন? দয়া সমুদ্রে আসতে হলে দয়ার নদী দিয়েই আসতে হবে। মনে করুন। আপনি দয়ার সমুদ্রে পৌছতে চাচ্ছেন। তা করতে হলে

দয়ার নদী দিয়ে আপনাকে এগোতে হবে। নৃশংসতার নদী দিয়ে আপনি কখনো দয়ার সমুদ্রে পৌঁছতে পারবেন না। শেকসপিয়র বাবাজি বললেও পারবেন না।

খালু সাহেব টেলিফোনের লাইন কেটে দিলেন। টেলিফোনের দোকানের লোকটা হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটার মুখে এক ধরনের সারল্য। মনে হচ্ছে টেলিফোনের দোকান দিয়ে সে সুখে আছে। কে কী কথা বলছে মন দিয়ে শুনছে। রাত এগারোটায় দোকান বন্ধ করে তার স্ত্রীর সঙ্গে সারা দিনে কী হলো গল্প করছে। আমি বললাম, ভাই আপনার কত হয়েছে? লোকটা হাসি মুখে বলল, হইছে অনেক। কিন্তুক আফনের কিছু দেওয়া লাগবে না। আপনে ফ্রি। এইসব ক্ষেত্রে আমার বলা উচিত— আমি ফ্রি কী জন্যে? আমি সে-সব কিছুই বললাম না। শান্ত ভঙ্গিতে বের হয়ে চলে এলাম। আবার টেলিফোন করতে এই দোকানে আসব। দেখা যাক তখনো ফ্রি হয় কিনা।

এখন কোথায় যাওয়া যায়? রাতে থাকার সমস্যা নেই। ফুলফুলিয়াদের বাসায় থাকি। আরামেই থাকি। আমি এবং খাঁ সাহেব একই খাটে পাশাপাশি ঘুমাই। খুবই অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার। তবে অস্বাভাবিকত্বটা খাঁ সাহেবের চোখে পড়ে না। তার আচার আচরণ দেখে মনে হয় এটাই স্বাভাবিক। মাজেদা সঙ্গীত বিতানের এজেন্ট তাঁর সঙ্গেই ঘুমাবে। রাত এগারোটার মধ্যে আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়। বারোটার পর শুরু হয় বাজনা। শুনতে শুনতে নেশা ধরে যায়।

রাত দুটার আগে কখনো বিছানায় যাওয়া হয় না। বিছানায় যাওয়া মানেই যে ঘুম তাও কিন্তু না। খাঁ সাহেব গল্প শুরু করেন। একেক দিন একেক ধরনের গল্প। প্রতিটি গল্পই বিচিত্র।

বাড়ি থেকে কত বছর বয়সে পালিয়েছি জানো?

জ্বি না।

অনুমান করো দেখি?

বারো বছর?

একে দুই দিয়ে ভাগ দিলে উত্তর পাবে।

ছয় বছর বয়সে পালিয়েছেন?

হুঁ। ক্লাস টুতে পড়ি। ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরছি। খেজুর গাছের কাছে এসে উষ্টা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। উঠে দেখি হাতের শ্লেট গেছে ভেঙে। মাথায় চক্কর দিয়ে উঠল। ঘরে সৎমা। খালি উছিলা খুঁজে কীভাবে মারবে। আজ শ্লেট ভাঙা, উছিলার প্রয়োজন নাই। ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

তখন পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

হুঁ।

বাড়িতে ফিরে গেলেন কখন?

আর ফেরা হয় নাই।

বলেন কী!

চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সে বাড়ি ফেরার একটা টান হলো। তখন সব ভুলে গেছি। কোথায় বাড়ি কোথায় ঘর কিছুই মনে নাই। কথায় কথায় লোকে বলে— বাপের নাম ভুলায়ে দিব। আমার হয়েছে এই অবস্থা। বাপের নাম ভুলে গেছি। শুধু দুইটা জিনিস মনে আছে। আমার সৎমার ডান কানের লতিটা কাটা। আর আমার একটা বোন ছিল, তার নাম পুঁই।

কী নাম বললেন?

পুঁই।

গ্রামের নাম মনে নাই?

নান্দিবাড়ি হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে রেললাইন গিয়েছে। একবার রেললাইনে একটা মহিষ কাটা পড়েছিল। বাপজানের সঙ্গে দেখতে গিয়েছিলাম। এইটা পরিষ্কার মনে আছে।

গ্রামের বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করে না?

আগে করত না। ইদানীং করে। মনে হয় আমার মৃত্যু ঘনায়ে এসেছে। মৃত্যুর সময় জন্মস্থানের মাটি ডাকাডাকি শুরু করে।... রাত মেলা হয়েছে এখন ঘুমাও। আগামীকাল ফুলফুলিয়ার মাকে কীভাবে বিবাহ করেছিলাম। সেই গল্প বলব। সেটা একটা ইতিহাস।

আপনি যা বলছেন সবই তো আমার কাছে মনে হচ্ছে ইতিহাস।

তাও ঠিক। আমার ইতিহাসের শেষ নাই। খুনের দায়ে জজকোর্টে আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। হাইকোর্টের রায়ে ছাড়া পাই। ছবছর হাজত খেটেছি।

কাকে খুন করেছিলেন?

কাউরে খুন করি নাই। খুন করতে সাহস লাগে। আমার সাহস নাই। সাহস থাকলে দুই তিনটা খুন অবশ্যই করতাম।

এখনো খুন করার ইচ্ছা আছে?

না। বুড়ো হয়ে গেছি। রক্ত পানশা হয়ে গেছে। তাছাড়া মৃত্যু ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। এত দিন দরজার বাইরে ছিল, এখন ঘরে ঢুকে পড়েছে। এখন চারপায়ে মেঝেতে হাঁটাহাঁটি করে। কোনো একদিন লাফ দিয়ে বুকের উপর উঠে পড়বে।

লাফ দিয়ে বুকের উপর উঠবে কীভাবে? মৃত্যু কি পশু?

অবশ্যই পশু। মৃত্যু দুই পায়ে হাঁটে না। চার পায়ে হাঁটে। পশুর শরীরে যেমন গন্ধ আছে মৃত্যুর শরীরেও গন্ধ আছে। যে মারা যায় সে মৃত্যুর ঘ্রাণ পায়। আমি পাই।

ঘ্রাণটা কেমন?

বুঝাতে পারব না। কষটা ঘাণ। ঘ্রাণে শরীর ভার হয়ে যায়। নিশার মতো লাগে।

ভাং-এর শরবত কখনো খেয়েছ?

জ্বি না।

ভাং-এর শরবতের ঘ্রাণের সাথে মিল আছে। যথাসময়ে মৃত্যুর গন্ধ তুমিও পাবে। আমার বলার প্রয়োজন নাই। থাক এইসব কথা। তোমার নিজের কথা কিছু শুনি। আমি একাই ভ্যাজর ভ্যাজর করি। অন্যের কথা শুনি না। বৃদ্ধ বয়সের ব্যাধি।

আমার নিজের কোনো কথা নাই।

অবশ্যই আছে। না থেকে পারে না। ফুলফুলিয়ার কাছে শুনেছি। তুমি নাকি সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় হাট। সত্য নাকি?

জ্বি।

হাঁট কী জন্যে?

অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য দেখি। দেখতে ভালো লাগে এই জন্যে হাঁটি।

অদ্ভুত দৃশ্যটা কী?

আছে অনেক কিছু।

একদিন নিয়ে যাবে তো আমাকে, দেখব।

জ্বি আচ্ছা।

কবে নিয়ে যাবে?

যেদিন আপনি বলবেন সেদিন। তোমার সঙ্গে যে-কোনোদিন বের হলেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখব?

অবশ্যই।

কাল সকালে যদি বের হই দেখব?

হ্যাঁ দেখবেন।

পরদিন আমি খাঁ সাহেবকে অদ্ভুত দৃশ্য দেখাতে নিয়ে গেছি। অতীশ দীপংকর রোডের পাশের গলিতে খোলামেলা জায়গায় বিশাল এক রাধাচুড়া গাছ। খাঁ সাহেব বললেন, এই তোমার অদ্ভুত দৃশ্য?

আমি বললাম, জ্বি।

এই দৃশ্য দেখার জন্যে দশ কিলোমিটার হেঁটেছ?

জ্বি।

রাধাচুড়া গাছ বাংলাদেশে এই একটাই?

না, প্রচুর আছে। তবে এটা বিশেষ এক রাধাচুড়া।

বিশেষ কেন?

গাছটার ভয়ঙ্কর কোনো ব্যাধি হয়েছে। মানুষের যেমন ক্যান্সার হয় গাছদেরও নিশ্চয়ই হয়। এরকম কিছু হয়েছে। ব্যথায় যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। গাছটার কাছে এসে দাঁড়ালে তার মৃত্যু-যন্ত্রণা টের পাওয়া যায়।

তুমি গাছটার মৃত্যু-যন্ত্রণা টের পাচ্ছ?

জ্বি পাচ্ছি। শুধু আমি একা না, পাখিরাও টের পাচ্ছে। আমরা অনেকক্ষণ হলো গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এই সময়ের মধ্যে কোনো পাখিকে কি গাছের ডালে বসতে দেখেছেন?

ঢাকা শহরে পাখি কোথায় যে গাছের ডালে বসবে?

পাখি না থাকুক কাক তো আছে। গাছের ডালে কিন্তু কোনো কাকও বসে নেই। গাছটার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন। তার যে জ্বর এসেছে হাত দিলেই টের পাওয়া যায়।

খাঁ সাহেব গাছে হাত রাখলেন। বিরক্ত গলায় বললেন, জ্বর কোথায়?

আমি বললাম, গাছের জ্বর তো মানুষের জ্বরের মতো না যে গায়ের তাপ বাড়বে। তাদের জ্বর অন্য রকম।

তোমার যে মাথা খারাপ এটা কি তুমি জানো?

জ্বি না। জানি না।

তোমার মাথা খারাপ। সামান্য খারাপ না, বেশ ভালো খারাপ।

হতে পারে।

তুমি কি হেঁটে হেঁটে ক্যান্সার হওয়া গাছ খুঁজে বের করা?

তা না। আমি আমার মতো হাঁটি। হঠাৎ হঠাৎ এরকম গাছ চোখে পড়ে।

তখন কী করা? গাছের জ্বর কমাবার জন্যে মাথায় পানি ঢাল?

বেশির ভাগ সময় কিছুই করি না। গাছের মৃত্যু দেখি। মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখি। দুএকটা ক্ষেত্রে গাছের মৃত্যু-যন্ত্রণা কমাবার চেষ্টা করি।

কীভাবে?

যেমন ধরেন এই গাছটার কী রোগ হয়েছে এটা ধরার জন্যে আমি নানান লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছি। বোটানিক্যাল গার্ডেনের এক রিসার্চ অফিসার বলেছেন, ফাংগাসের

সংক্রমণ হয়েছে। তাঁর কথামতো গাছে ফাংগাসের ওষুধ দিয়েছি। বলধা গার্ডেনের একজন মালী বলল, গাছের নিচের মাটিতে উইপোকা বাসা বানিয়েছে। এরা গাছের শিকড় খেয়ে ফেলছে। মালীর কথামতো গর্ত খুঁড়ে উইপোকার ওষুধ দেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানির একজন শিক্ষক বলেছেন–গাছটার বিশেষ ধরনের রোগ হয়েছে। এই রোগের বৈজ্ঞানিক নাম হলো–এনথ্রাকনোস। তার কথামতো এর চিকিৎসা চলছে।

কোনো পীর সাহেবের কাছ থেকে তাবিজ এনে দিচ্ছে না কেন?

তাবিজের কথা মাথায় আসে নি। তবে স্থানীয় মসজিদের মোয়াজেন্ম সাহেবের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে। উনি প্রতিদিন বাদ আছর গাছটার জন্যে দোয়া করেন।

ঠাট্টা করছ?

না, ঠাট্টা করছি না। মানুষের জন্যে যদি দেয়া করা যায় তাহলে গাছের জন্যেও দোয়া করা যায়। গাছেরও প্রাণ আছে। জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার।

ওষুধপত্র দেয়া এই সবে কাজ হচ্ছে না?

জ্বি না। একটার পর একটা ডাল মরে যাচ্ছে। আগে কিছু সবুজ পাতা ছিল এখন তাও নেই। গাছটা মনে হয় কোমায় চলে গেছে।

তুমি কি রোজ গাছটাকে দেখতে আস?

রোজ আসতে পারি না। তবে দুএকদিন পরে পরে আসি।

আশ্চর্য কাণ্ড!

আমি বললাম, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি খুবই বিরক্ত হচ্ছেন। চলুন ফেরা যাক। হেঁটে ফিরবেন? না-কি রিকশা নেব?

টাইম কত?

চারটা দশ।

আছর ওয়াক্তের তাহলে বেশি বাকি নাই। আছর পর্যন্ত অপেক্ষা করি। মোয়াজেন্ম সাহেব এসে গাছের জন্যে মোনাজাত করুক— এই দৃশ্যটা দেখে যাই। অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে বের হয়েছি, অদ্ভুত দৃশ্য দেখে যাই। মোয়াজ্জেম সাহেবের নাম কী?

ইদারিস মুনশি। উলা পাশ। অতি পরহেজগার আদমি। গাছের জন্যে উনি কোরান মজিদ খতম দিয়েছেন।

এখন তোমার একটা কথাও বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে তুমি রসিকতা করছি। আমার বাজনার সিডি বের করার ব্যাপারটাও রসিকতা। তুমি ধান্দাবাজ একজন মানুষ।

অতি সহজেই আমরা মানুষ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে চলে আসি। মানব চরিত্রের এটা একটা বড় দুর্বলতা। একটা মানুষ সম্পর্কে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব তার মৃত্যুর বারো বছর পর। মৃত্যুর পর পর কোনো মানুষ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। মৃত্যুর কারণে লোকটার প্রতি মমতা চলে আসে। বারো বছর পার হবার পর সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

তখন সিদ্ধান্ত নিয়ে লাভ কী?

আগেই বা সিদ্ধান্ত নিয়ে লাভ কী?

তোমার তর্ক ভালো লাগছে না!

চা খাবেন? আসুন চা খাই। চা খেতে খেতে ইদারিস সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করি। সময় কাটাতে হবে। কোনো কিছুর জন্যে অপেক্ষা শুরু করলেই সময় স্লো হয়ে যায়। টাইম ডাইলেশন হয়।

চা খাব না। এখানেই বসে থাকব।

রোদে বসে থাকার দরকার কী— চলুন ছায়ায় গিয়ে বসি।

না।

খাঁ সাহেব মুখ গম্ভীর করে রোদে বসে রইলেন। প্রায় এক ঘন্টা পর মাওলানা ইদারিসকে আসতে দেখা গেল। তিনি এসে দ্রুত গাছের চারদিকে একবার ঘুরলেন। হাত তুলে মোনাজাত করলেন। মোনাজাত শেষে গাছে তিনটা ফুঁ দিলেন।

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, অবস্থা কেমন বুঝছেন?

মাওলানা শান্ত গলায় বললেন, অবস্থা যা বোঝার আল্লাহপাক বুঝবেন। আমি দোয়া করে যাচ্ছি, বাকি উনার মর্জি।

কোনো খতম পড়ার কথা কি ভাবছেন?

ইদারিস সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, দরুদে শেফা এক লক্ষ পাঁচশ বার পড়া যায়। শেফা শব্দের অর্থ আরোগ্য। দরুদে শেফা রোগমুক্তির জন্যে ভালো দোয়া।

আমি বললাম, দরুদে শেফা শুরু করে দিন।

জ্বি আচ্ছা। গাছটা বাঁচবে কি বাঁচবে না এটা জানার জন্যে ইফতেখারা করেছিলাম।

সেটা কী?

কিছু দোয়া দরুদ পড়ে রাতে ঘুমাতে যেতে হয়। তখন স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহপাক জানিয়ে দেন।

আপনি কী জানলেন?

বুঝতে পারছি না। ইফতেখারার উত্তর আল্লাহপাক সরাসরি দেন না। রূপকের মাধ্যমে দেন। তার অর্থ বের করা খুব কঠিন।

স্বপ্নে কী দেখেছেন। আপনি বলুন–দেখি আমরা উত্তর বের করতে পারি কি না।

স্বপ্নে দেখেছি আপনি মারা গেছেন। গাছের নিচে আপনার নামাজে জানাজা হচ্ছে। জানাজা আমিই পড়াচ্ছি।

এর মানে কী?

বললাম না জনাব, ইফতেখারা করে পাওয়া স্বপ্নের মানে বের করা খুব জটিল।

মওলানা সাহেব চলে যাবার পর আমি খাঁ সাহেবকে বললাম, চলুন যাই।

খাঁ সাহেব বললেন, তুমি যাও। আমি একটু পরে আসব।

কেন?

তোমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করছে না। আর এখানে আরো কিছুক্ষণ থাকতে ইচ্ছা! করছে। আমি খাঁ সাহেবকে রেখে চলে এলাম। গাছ নিয়ে খাঁ সাহেবের সঙ্গে পরে আর কোনো কথা হয় নি। তবে আমি মোটামুটি নিশ্চিত মৃত্যুপথ যাত্রী গাছটা তাঁর মাথায় ঢুকে গেছে। সুযোগ পেলেই তিনি একা একা গাছটার কাছে চলে আসেন। মানুষ অতি বিচিত্র প্রাণী। মানুষের পক্ষে সব কিছুই করা সম্ভব।

অনেক দিন গাছটার খোঁজ নেয়া হয় না। আজ যাওয়া যেতে পারে। এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার দরুদে শেফা নিশ্চয়ই পড়া হয়ে গেছে। তার ফলাফল কী জানা দরকার।

একবার খালু সাহেবের কাছেও যাওয়া দরকার। তাঁর অফিসে ঢুকে তাঁকে চমকে দেয়া। সিরিয়াস ধরনের মানুষকে চমকে দেয়ার আনন্দই আলাদা।

৫. মন বিক্ষিপ্ত কেন

ভূত দেখার মতো চমকে উঠা— এ ধরনের বাক্য বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত আছে। খালু সাহেব তাঁর অফিসে আমাকে দেখে ভূত দেখার মতোই চমকে উঠলেন, তবে চমকটা নিজে নিজে হজম করলেন। তিনি ফাইল দেখছিলেন। চোখ নামিয়ে কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে ফাইল দেখতে লাগলেন। আমি তার সামনের চেয়ারে বসলাম। তিনি ফাইল দেখা শেষ করে বেল টিপে কাকে যেন আসতে বললেন। যে এসে ঘরে ঢুকাল তাকে কিছুক্ষণ ধমক ধমকি করে ফাইল দিয়ে দিলেন। তারপর আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন। আমি বললাম, খালু সাহেব কেমন আছেন?

খালু সাহেব বললেন, তুমি কি সৌজন্য সাক্ষাতের জন্যে এসেছ না অন্য মতলব আছে?

আমি বললাম, আপনাকে দাওয়াত দিতে এসেছি।

কীসের দাওয়াত?

মাজেদা সঙ্গীত বিতানের প্রথম সিডির রেকর্ডিং হবে। আগামী শুক্রবার। স্টুডিও দুই শিফটের জন্যে ভাড়া করা হয়েছে। রেকর্ডিং শুরু করার আগে মিষ্টি খাওয়া হবে। আর্টিস্টকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে। ছোট্ট অনুষ্ঠান। আপনি সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি।

আমি সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি?

জ্বি।

তুমি ঠিক করেছ?

জ্বি।

আমি ঠিক করেছি। ঐ দিন। আপনার অফিসও থাকবে বন্ধ। দিনটাও শুভ —শুক্রবার।

ঠিক করে বলো তো তুমি আমার কাছে চাও কী?

খালু সাহেব, আমি তো ঠিক করেই বলেছি। আমি চাই আপনি মহরত অনুষ্ঠানের সভাপতি হন।

শোন হিমু, দুই রকমের মাছ আছে— গভীর জলের মাছ আর অগভীর জলের মাছ। তুমি এই দুটার বাইরের মাছ। তুমি হলে পাতালের মাছ। তুমি নিশ্চিত পরিকল্পনা নিয়ে আগাও, কেউ বুঝতে পারে না পরিকল্পনাটা কী। যখন বুঝতে পারে তখন কিছু করার থাকে না। কারণ পরিকল্পনা ততক্ষণে শেষ। তুমি যা করতে চেয়েছ তা করা হয়ে গেছে। ঝেড়ে কাশ। বলো কী করতে চাচ্ছি। নীল নকশাটা কী?

আমি বললাম, আমার কোনো নীল নকশা নেই খালু সাহেব।

খালু সাহেব কঠিন গলায় বললেন, অবশ্যই আছে। তুমি শুধু সঙ্গীত বিতান করে। একজনের সিডি বের করবে তা হয় না। তোমাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। এসো খোলাখুলি আলোচনা কর। তার আগে বলে জহির কোথায়?

আমি জানি না। সে কোথায়?

তার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ নেই?

জ্বি না।

জহির আমার অফিসের ঠিকানায় একটা চিঠি পাঠিয়েছে। এই চিঠি আমি তোমার খালাকে দেখাই নি, লুকিয়ে রেখেছি। তোমাকে পড়তে দিচ্ছি, তুমি চিঠিটা পড়। একবার না তিন-চার বার পড়। চিঠি পড়ার পর আমাকে বলো চিঠির মানে কী?

মানে বুঝতে পারছেন না?

না, আমি চিঠির অর্থ বুঝতে পারছি না। আমার মাথায় কুলাচ্ছে না। খালু সাহেব ড্রয়ার খুলে চিঠি বের করে দিলেন। আমি চিঠি পড়তে শুরু করলাম। জহির লিখেছে—

বাবা,

তুমি এবং মা, তোমরা দুজনই নিশ্চয়ই আমার ওপর খুব রাগ করেছ। রাগ করাই স্বাভাবিক। আমি যে কাণ্ডটা করেছি। সেটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য না। আমি খুব অস্থির ছিলাম বলেই হুট করে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। হাঁটা শুরু করার পর থেকে অস্থিরতা কেটে গেছে। যতই হাঁটছি। ততই অস্থিরতা কমছে। আমার ধারণা শাহপরী দ্বীপে পৌঁছে সমুদ্র স্নান করার পরপর অস্থিরতা পুরোপুরি কেটে যাবে। আমি অন্য মানুষ হয়ে যাব। হিমু ভাইজান আমাকে এ রকমই বলেছেন।

এখন আমার হাঁটার অভিজ্ঞতা বলি। আমি তেতুলিয়ায় বাংলাদেশ বর্ডারের শেষ সীমা থেকে হাঁটা শুরু করেছি। কখন শুরু করলাম বলতে পারছি না। কারণ আমার সঙ্গে ঘড়ি নেই। তবে হাঁটা শুরু করেছি। সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক করে রেখেছি। হাঁটা শেষ করব। সূর্যাস্তের সময়। প্রথম দিন একুশ মাইল হেঁটেছি। খাওয়া দাওয়া অসুবিধা হয় নি। যে দুটা বাড়িতে ভাত চেয়েছি সেই দুবাড়ি থেকেই ভাত দিয়েছে। একজন আবার খুবই আদর যত্ন করল। পোলাও রাঁধল। খাওয়ার সমস্যা আমার হবে বলে মনে হচ্ছে না। বাথরুমের সমস্যা হচ্ছে। জঙ্গলে বাথরুম সারা বেশ ঝামেলার ব্যাপার।

সবচে বড় সমস্যা মুখ ভর্তি দাড়ি হওয়ায় সারাক্ষণ মুখ কুটকুট করছে। আরেকটা সমস্যা হলো পায়ে ফোসকা পড়ে গেছে। কেডস-এর জুতা জোড়া মনে হয় টাইট হয়েছিল। জুতা ফেলে দিয়ে এখন খালি পায়ে হাঁটছি। খালি পায়ে হাঁটার জন্যে স্পীড একটু কমে গেছে। দুপুরে মাটি তেতে থাকে। তার ওপর দিয়ে হাঁটাই মুশকিল।

হাঁটা শুরুর পঞ্চাশ দিনের দিন খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। আশ্চর্যজনক এবং অবিশ্বাস্য। তবে এ রকম কিছু যে ঘটবে তা আমি জানতাম এবং ঘটনাটার জন্যে মনে মনে প্রস্তুতও ছিলাম। তোমাকে টেনশনে না রেখে ঘটনাটা বলি। বুধবার সকাল আটটা নটার দিকে (অনুমানে বলছি, আমার সঙ্গে ঘড়ি নেই।), হাঁটা শুরু করলাম। সদর রাস্তায় পা দিয়েই দেখি হিমু। ভাইজান। আমাকে দেখেই বলল, কী-রে তুই এত বেলা করে হাঁটা শুরু করছিস কেন? আমি হিমু ভাইজানকে দেখে খুবই অবাক হলাম। কিন্তু ভাব করলাম যেন মোটেই অবাক হই নি। হিমু ভাইজান সবাইকে অবাক করতে চায়। কেউ অবাক না হলে মনে দুঃখ পায়। হিমু ভাইজানের সঙ্গে রহস্য করতে আমার খুবই মজা লাগে।

হিমু ভাইজানকে দেখে আমার প্রথম প্রশ্ন করা উচিত ছিল তুমি কোত্থেকে এলে? আমি যে এখানে আছি তুমি জানলে কীভাবে? আমি কোনো রকম প্রশ্ন না করে হাঁটা শুরু করলাম। দুপুর পর্যন্ত হাঁটালাম। একা একা হাঁটা খুব বোরিং ব্যাপার। হিমু ভাইজানের মতো মজার একজন মানুষের সঙ্গে হাঁটা খুবই আনন্দময় অভিজ্ঞতা। দুপুর পর্যন্ত আমরা এক সঙ্গে হাঁটালাম। দুপুরবেলা হিমু ভাইজান বলল, তোর হাটার কথা তুই হাঁটছিস। আমি তোর সঙ্গে কষ্ট করছি কেন?

আমি বললাম, সেটা তুমি জানো। আমি তো তোমাকে বলি নি। আমার সঙ্গে হাঁটতে।

হিমু ভাইজান বলল, আমি ঢাকা চলে যাই। তোর হাঁটা তুই হাট।

আমি বললাম, যাও।

সাধাসাধির ধার দিয়েও গেলাম না। ঠিক করে রাখলাম হিমু। ভাইজান ডালে ডালে চললে আমি চলাব পাতায় পাতায়। হিমু ভাইজান পাতায় পাতায় চললে আমি চলব। শিরায় শিরায়।

যাই হোক হিমু ভাইজান দুপুরবেলা চলে গেল। তবে আমি নিশ্চিত সে বেশিদূর যায় নি। বাসে করে খানিকটা এগিয়ে রইল। আবার পথে দেখা দেবে। এ রকম করতে করতে সে আমার সঙ্গে শাহপরী দ্বীপ পর্যন্ত যাবে। এই দুনিয়াতে কত অদ্ভুত মানুষই না হয়।

বাবা তুমি ভালো থেকে। আমাকে নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করবে না। সমুদ্রে ডুব দেবার পর অবশ্যই আমি ভালো মানুষ হয়ে যাব। আমার মনের সব গ্লানি, ক্লেদ, যন্ত্রণা সমুদ্রের নোনা জলে রেখে আসব। মাকে আলাদা চিঠি দিলাম না। এই চিঠিটাই তাকে পড়তে দিও।

ইতি

ভবঘুরে জহির

খালু সাহেব বললেন, চিঠি শেষ করেছ?

আমি বললাম, জ্বি। তুমি কি গিয়েছিলে জহিরের কাছে?

জ্বি না।

তাহলে ঘটনাটা কী? জহির কি পাগল হয়ে গেছে?

এখনো হয় নি, তবে হব হব করছে। তোমার পরিকল্পনাটা তো এই ছিল। ছেলেটাকে পাগল বানিয়ে দেয়া। আমি তো পরিষ্কার চোখের সামনে দেখছি, জহির নেংটো হয়ে প্রেসক্লাবের সামনে ট্রাফিক কন্ট্রোল করছে।

এতদূর মনে হয় যাবে না।

যেতে বাকি কোথায়? সে চোখের সামনে দেখছে তার পেয়ারের হিমু ভাইজান তার সঙ্গে হাঁটছে।

আমি শান্ত গলায় বললাম, ঘটনাটা কী হয়েছে বলি। জহিরের মনে প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। তাকে একা একা হাঁটতেও হচ্ছে। কাজেই জহিরকে এই স্ট্রেস এবং নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য জহিরের মস্তিষ্ক আমাকে তৈরি করে জহিরের পাশে হাঁটাচ্ছে।

এক কথায় সমাধান?

জ্বি এক কথায় সমাধান। খালু সাহেব, কফি খেতে ইচ্ছা করছে। অনেক দিন আগে আপনার অফিসে কফি খেয়েছিলাম, স্বাদটা এখনো মুখে লেগে আছে।

খালু সাহেব শীতল গলায় বললেন, স্বাভাবিক সৌজন্য বোধের কারণেও তোমাকে কফি খাওয়ানো উচিত। কিন্তু তোমাকে কফি আমি খাওয়াব না। যে এত বড় সমস্যা আমার পরিবারে তৈরি করেছে তাকে আমি ছাড়ব না। তোমার নামে যে ওয়ারেন্ট বের হয়েছে এটা তুমি শুনেছ?

শুনেছি। কোন ধারার মামলা?

ধারা ফারা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না–আমি আমার লইয়ারকে বলে দিয়েছি আগামী পাঁচ বছর তোমাকে জেলে আটকে রাখার ব্যবস্থা যেন করা হয়। মিথ্যা অভিযোগ, মিথ্যা সাক্ষীতে কিছু যায় আসে না। আমি দেখতে চাই পাঁচ বছর যেন তোমাকে সোসাইটি থেকে বাইরে রাখা হয়।

খালুজান উঠি?

হ্যাঁ উঠ। আমি পুলিশ ডেকে এখনই তোমাকে এরেস্ট করিয়ে দিতে পারি। সেটা করব না। পুলিশই তোমাকে খুঁজে বের করবে।

খালু সাহেব। আপনি কি বাজনা রেকর্ডিং-এ যাবেন? ইয়েস-নো কিছু একটা বলে দিন। আপনি না বললে প্রফেশনাল কোনো প্রধান অতিথি নিয়ে আসব।

আমার সামনে থেকে দূর হও।

জ্বি আচ্ছা দূর হচ্ছি।

রাস্তায় নেমে মনে হলো আমার কাজকর্ম গুছিয়ে ফেলা উচিত। খালু সাহেব এবার আমাকে ছাড়বে না। জেলখানায় ঢুকাবে। এটা এক অর্থে মন্দ না। নিশ্চিত মনে কিছুদিন কাটানো যায়। খাওয়া দাওয়ার ঝামেলা নেই। ঘুমানোর সমস্যা নেই। সব দায়দায়িত্ব সরকারের। আমার মতো মানুষদের জন্যে জেলখানার মতো ভালো থাকার জায়গা আর কী হতে পারে। মৎস্য মারিব খাইব সুখে-র মতো— জেলখানায় থাকিব, খাইব সুখে।

জেলে ঢোকার আগে করণীয় কাজকর্মের লিষ্ট মনে মনে করে ফেললাম।

ক. খাঁ সাহেবের গানের সিডি। (ভুজুং ভাজং দিয়ে খালার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে)

খ. খালার সঙ্গে ভুজুং ভাজং টাকা আদায় পর্ব। (টেলিফোনে কথা বলা, খাঁ সাহেবের সঙ্গে খালার পরিচয় করিয়ে দেয়া)

গ. রাধাচুড়া গাছের সঙ্গে শেষ দেখা। (সেটা আজই হতে পারে)

ঘ. জহিরের সঙ্গে কথা বলা। (মনে হচ্ছে সেটা সম্ভব হবে না। জহিরের মিশন শেষ হতে হতে তিন মাস লাগবে। তিন মাস সময় আমার হাতে নেই।)

ঙ. ফুলফুলিয়া! (ফুলফুলিয়ার বিষয়ে কিছুই মাথায় আসছে না। কিন্তু নামটা লিখে রাখা দরকার।)

এখন এক এক করে আগানো যাক।

ক. খাঁ সাহেবের গানের সিডি।

সব ব্যবস্থা করা আছে। শুধু টাকার জোগাড় হয় নি। এবং সিডির কভার ডিজাইন বাকি আছে। কভার ডিজাইনের জন্যে ধ্রুব এষকে ধরতে হবে। কী কারণে যেন সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। যে ফ্ল্যাট বাড়িতে সে থাকে তার দরজায় এ4 সাইজের একটা কাগজ। সেখানে একটা উড়ন্ত কাকের ছবি, তার নিচে ধ্রুবের হাতে লেখা— পাখি উড়ে গেছে।

আমাকে যা করতে হবে তা হলো এই কাগজ ফেলে দিয়ে অন্য একটা কাগজ সাটতে হবে। সেই কাগজে লেখা থাকবে–পাখি ফিরে এসো।

ধ্রুব হয়তো জানে না, যে পাখি উড়ে যায়। তাকে ফিরে আসতে হয়। খাঁচায় বন্দি পাখিরই শুধু উড়ে যাওয়া বাঁ ফিরে আসার ব্যাপার থাকে না। তার শুধুই অবস্থান।

দোকান থেকে এ4 সাইজের কাগজ এবং লাল মার্কার কিনে ধ্রুবের ফ্ল্যাটে উপস্থিত হলাম। দরজায় পাখি উড়ে গেছে স্লোগান নেই। তার বদলে একটা কাকের ছবি। কাকটা লাল চোখে তাকিয়ে আছে, তার পয়ে লোহার শিকল। অদ্ভুত সুন্দর ছবি।

আমি ধ্রুবের দরজার কলিংবেল টিপলাম। ভেতর থেকে ধ্রুব ঘুম মাখা গলায় বলল, কে?

আমি হিমু। আমার ব্যাঞ্জোর কভার কোথায়?

টাকা এনেছেন?

না।

টাকা আনেন নি কেন?

এখনো জোগাড় করতে পারি নি।

জোগাড় হবে?

বুঝতে পারছি না।

আমার দরজায় যে শিকল পরা কাকের ছবি আছে। ঐটা নিয়ে যান। ফটোসেটে সিডির নামটা বসিয়ে দেবেন। কাকের চোখে যে লাল রঙ আছে। ঐ লাল রঙে সিডির নামটা হবে। সিডির নাম কী?

নাম–একলা পাখি।

নামটা কি এখন ঠিক করলেন?

জ্বি। দরজাটা খুলুন সুন্দর একটা ডিজাইন করেছেন, আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে যাই।

দরজা খুলতে পারব না। আমি সারা রাত ঘুমাই নি, এখন ঘুমুচ্ছি। আপনি দরজার বাইরে থেকেই ধন্যবাদ দিন।

ধন্যবাদ।

আচ্ছা ঠিক আছে। এখন বিদেয় হোন। প্লিজ। আর বিরক্ত করবেন না। আরেকটা কথা–কভার ডিজাইনের জন্যে টাকা নিয়ে আসার দরকার নেই। কাকের ছবিটা আমি সিডির কভারের জন্যে আঁকি নি। কাজেই এর জন্যে টাকা নেয়া অন্যায় হবে।

খ. ভুজুং ভাজুং টাকা আদায় পর্ব।

আমার পরিচিত টেলিফোনের দোকান থেকে (আগেরবার –এই লোক টেলিফোনের টাকা নেয় নি) খালাকে টেলিফোন করলাম। টেলিফোনওয়ালা ঐ দিনের মতোই হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হচ্ছে এই লোক আজও টাকা নেবে না।

স্নামালিকুম, খালা আমি হিমু।

বুঝতে পারছি। কী চাস?

টাকা চাই খালা। আজ ছাব্বিশ হাজার দিলেই হবে। স্টুডিও এবং হ্যান্ডস-এর খরচ।

কীসের স্টুডিও, কীসের হ্যান্ডস?

আমাদের সিডি বের হবে। শুক্রবারে রেকর্ডিং। প্রধান অতিথিকে দাওয়াত দেয়া হয়ে গেছে। তিনি এপয়েন্টমেন্ট ডায়রিতে দিন এবং সময় লিখে রেখেছেন। ঐ দিন তাকে গাড়ি করে আনতে হবে এবং বাসায় দিয়ে আসতে হবে। খালা, শুক্রবারে তোমার গাড়িটাও লাগবে।

হিমু, তুই পুরো ব্যাপারটা ভুলে যা। আমি এর মধ্যে নেই।

সে-কী?

সে-কী ফে-কী বলে। লাভ নেই। তোর খালু আমার উপর খুব রাগ করেছে।

লোকে গাছে তুলে মই কেড়ে নেয়। তুমি তো আমাকে চাঁদে পাঠিয়ে রকেট কেড়ে নিয়েছ।

কেড়ে নিয়েছি। ভালো করেছি— তুই থাক চাঁদে বসে। আমার ছেলের কোনো খোঁজ নেই। আর আমি খুলবা সিডি কোম্পানি!

এইগুলো তো তোমার কথা না। খালু সাহেবের কথা।

যার কথাই হোক সত্যি কথা। হিমু আমার মাথা ধরেছে— আমি তোর সঙ্গে গজগজ করতে পারব না।

আমি খাঁ সাহেবকে কী বলব?

তুই তাকে কী বলবি সেটা তুই জানিস। উনি বিখ্যাত মানুষ, অন্য সিডি কোম্পানি তাঁকে লুফে নেবে। এটা নিয়ে তোর সঙ্গে আমি আর কথা বলব না।

আচ্ছা বেশ কথা শেষ। শুক্রবারটা ফ্রি রেখো।

কেন?

বললাম না। শুক্রবারে সিডির রেকর্ডিং। তুমি অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি।

আরো গাধা আমি এক কথা কতবার বলব! আমি সিডির মধ্যে নেই।

সিডিতে তো থাকতে বলছি না। বিশেষ অতিথিতে থাকতে বলছি। তোমার কাজ হবে সঙ্গীতের উপর একটা বক্তৃতা দেবে, তারপর খাঁ সাহেবের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেবে।

জীবনে আমি বক্তৃতা দেই নি।

বক্তৃতা না দিতে পারলে নাই। ফুলের তোড়াটা দিতে পারবে। না কি সেটাও পারবে না?

আসুক শুক্রবার। তারপর দেখা যাবে।

খালা খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। আমি টেলিফোনওয়ালার দিকে তাকিয়ে বললাম, ভাই কত হয়েছে?

টেলিফোনওয়ালা ঐ দিনের মতো বলল, স্যার আপনার কাছ থেকে পয়সা নেব না।

আমি বললাম, কেন?

আপনি একবার আমাকে খুব বড় একটা উপকার করেছিলেন। মানুষ উপকারের কথা মনে রাখে না। আমি দরিদ্র মানুষ কিন্তু আমি উপকারের কথা মনে রাখি।

কী উপকার করেছিলাম?

সেটা আপনাকে বলব না। আপনার যেহেতু মনে নাই আমি মনে করায়ে দিব না।

শুক্রবার কি আপনার কাজকর্ম আছে?

দোকানে বসে থাকা— এছাড়া আর কাজকর্ম কী!

শুক্রবারে তাপনার দাওয়াত। বাজনা শোনার দাওয়াত। ব্যাঞ্জো বাজনা!

গান বাজনা আমার ভালো লাগে না। কিন্তু আপনি দাওয়াত দিয়েছেন। আমি অবশ্যই যাব। শুক্রবার আমার দোকান থাকবে বন্ধ।

গ. রাধাচুড়া গাছের সঙ্গে শেষ দেখা।

যা মনে মনে ভেবেছিলাম। তাই। রাধাচুড়া গাছের নিচে গম্ভীর মুখে খাঁ সাহেব বসে আছেন। তিনি আমাকে দেখে সামান্য লজ্জা পেলেন বলে মনে হলো। খুকধুক করে। শুকনা কাশি কাশতে লাগলেন। আমি বললাম, কখন এসেছেন?

খাঁ সাহেব অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, এই তো কিছুক্ষণ আগে। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম গাছটা দেখে যাই।

কী দেখলেন?

অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। আগে তিনটা ডালে পাতা ছিল। এখন মাত্র দুটা ডালে আছে। তার মধ্যে একটার পাতা হলুদ হওয়া ধরেছে। আমি কোনো আশা দেখছি না।

আপনার মনে হয় মন খারাপ।

মন খারাপ টারাপ না, এতগুলা মানুষ গাছটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। চেষ্টা কাজে লাগছে না। এইটা দেখে খারাপ লাগছে। রুগ্ন গাছের গোড়ায় তুতে দিলে উপকার হয়। শুনেছি। আজ কিছু তুতে দিয়েছি। আর কী করা যায় মাথায় আসছে না।

আপনি কি রোজই এখানে আসেন?

রোজ না হলেও প্রায়ই আসি।... কথাটা ঠিক বললাম না, রোজই আসি। কী জন্যে জানি গাছটার উপর মায়া পড়ে গেছে।

আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে গাছের উপর মায়া পড়ে যাওয়াতে আপনি লজ্জা পাচ্ছেন। লজ্জা পাচ্ছেন কেন?

মানুষের উপর কোনোদিন মায়া পড়ল না। গাছের উপর মায়া। এই জন্যেই লজ্জা লাগে। আচ্ছা হিমু, কয়েকদিন থেকে একটা ব্যাপার। আমার মাথার মধ্যে ঘুরছে। ঐটা করলে কেমন হয়?

ঐটা মানে কী?

মোঘল সম্রাট বাবরের ব্যাপারটা।

খুলে না বললে বুঝতে পারছি না।

ঐ যে সম্রাট বাবরের পুত্র হুমায়ূন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জীবন সংশয়। চিকিৎসকরা জবাব দিয়ে দিয়েছেন। তখন এক গভীর রাতে সমাট বাবর তার ছেলের বিছানার চারদিকে ঘুরতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, হে আল্লাহপাক, আমার জীবনের বিনিময়ে আমার পুত্রের জীবন রক্ষা কর। সকালেই ছেলে সুস্থ হতে শুরু করল আর সম্রাট বাবর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কয়েকদিনের মধ্যেই হুমায়ূন সুস্থ হয়ে উঠলেন, সম্রাট বাবর মারা গেলেন।

আপনার মাথায় কি এরকম কিছু আছে নাকি? নিজের জীবন দিয়ে গাছের জীবন রক্ষা করা।

আরে না। কথার কথা বলেছি। আমার তো মাথা খারাপ হয় নি।

চলুন বাসায় যাই।

তুমি যাও। মওলানা সাহেব আছর ওয়াক্ত আসবেন। দরুদে শেফার খতম তিনি শেষ করেছেন। আজ দোয়া হবে। দোয়ায় সামিল হব।

ঠিক আছে আপনি থাকুন। আমি রাধাচুড়া গাছের দিকে তাকিয়ে বললাম, হে বৃক্ষ বিদায়।

ঘ. জহিরের সঙ্গে কথা বলা।

কথা বলা সম্ভব হলো না। সে কোথায় আছে কে জানে। হাঁটো পথিক হাঁটো।

হন্টন শুধু হন্টন

নিজ দুঃখ

পথ মাঝে

করিও বণ্টন।

ঙ. ফুলফুলিয়া।

মেয়েটার কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। সমস্যা ধরতে পারছি না। সে যে মাঝে মাঝে লুকিয়ে কাঁদে তা তার চোখ দেখে বোঝা যায়। আমার প্রতি তার ব্যবহার খুব আন্তরিক ছিল, সেই আন্তরিকতায় ভাটা পড়েছে। এখন মনে হয় সে বিরক্তও হয়। ঐ দিন জিজ্ঞেস করলাম, জহিরের চিঠিটা কি এসেছে? সে তার জবাবে কঠিন গলায় বলেছে, আপনার কথা আমার মনে আছে। চিঠি তুলে রেখেছি। যেদিন পড়তে বলবেন—পড়ব।

মেয়েটার কি তার স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না? স্বামীর প্রসঙ্গে ফুলফুলিয়া কখনো কিছু বলে না। প্রবাসী স্বামীর প্রসঙ্গ একবারও আসবে না— সেটা কেমন কথা? একবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফুলফুলিয়া স্বামীর কাছে কবে যাবে?

ফুলফুলিয়া বলল, কেন জানতে চাচ্ছেন?

আমি বললাম, পাহাড় জঙ্গলের দেশ আমার কখনো দেখা হয় নি। ঠিক করেছি আমিও তোমার সঙ্গে যাব। পাহাড় জঙ্গলে ঘুরব।

ফুলফুলিয়া বলল, ঠিক আছে।

সে মুখে বলল, ঠিক আছে, কিন্তু আমার মনে হলো ঠিক নেই। সব কিছুই এলোমেলো। ফুলফুলিয়ার বাবার গানের সিডি বের হচ্ছে। এ বিষয়েও তার কোনো উৎসাহ নেই, অথচ মেয়েটা এমন ছিল না। ফুলফুলিয়ার সঙ্গে একদিন বসতে হবে। প্রাইভেট সিটিং। অনেক উল্টাপাল্টা কথা বলে ফুলফুলিয়ার মনের চারদিকে যে শক্ত আবরণটি তৈরি হয়েছে সেটা

ভেঙে দিতে হবে। পাঁচ প্রশ্নের খেলা, খেলা যেতে পারে। পাঁচটি প্রশ্ন করে উত্তর বের করতে হবে। উত্তর বের করতে না পারলে আমার যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ভালো না লাগলেও উত্তর দিতে হবে।

বলো তো ফুলি জিনিসটা কী? সে ঝিকমিক করে। তাকে দেখা যায় প্রবল শোকে ও প্রবল আনন্দে।

সে দেখতে কেমন?

তার কোনো আকৃতি নেই, কিন্তু সে ঝিকমিক করে।

তার বর্ণ কি?

তার কোনো বর্ণ নেই, কিন্তু সে ঝিকমিক করে।

সে কোথায় থাকে?

সে সব জায়গায় নানান ভঙ্গিমায় আছে। আকাশে আছে বাতাসে আছে, সমুদ্রে আছে, মরুভূমিতে আছে। আর মাত্র দুটি প্রশ্নের সুযোগ আছে। দুটি প্রশ্ন করে জেনে নাও জিনিসটা কী।

পারছি না।

জিনিসটা— চোখের জল। এখন আমার পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। পাঁচটা প্রশ্নের একই উত্তর হলে চলবে না। পাঁচ ধরনের উত্তর হতে হবে।

প্রথম প্রশ্ন— মন বিষণ্ণ কেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন— মন বিষণ্ণ কেন?

তৃতীয় প্রশ্ন—মন বিষণ্ণ কেন?

চতুর্থ প্রশ্ন— মন বিষণ্ণ কেন?

পঞ্চম প্রশ্ন— মন বিষণ্ণ কেন?

৬. বিখ্যাত ওস্তাদ

মাজেদা খালা বলল, ঐ বুড়োই কি তোর বিখ্যাত ওস্তাদ?

আমি বললাম, হুঁ। ব্যাঞ্জোরাজ ওস্তাদ শমসের উদ্দিন খাঁ।

খাঁ সাহেব রেকর্ডিংরুমে কার্পেটের উপর মাথা নিচু করে বসে আছেন। তাঁর ডানপাশে ফুলফুলিয়া। খাঁ সাহেব কিছুক্ষণ পরপর কাশছেন। জটিল ধরনের কাশি। কাশির সময় ফুলফুলিয়া বাবার পিঠে হাত রাখছে। রেকর্ডিংরুমের বিশাল জানালাটা কাচের। বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে। আমি বললাম, খালা ভালো করে দেখ। ইনিই তোমার বিছানায় বসে ছিলেন না?

খালা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, মানুষটাকে তো দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ।

বকর বকর করে কাশছে।

হুঁ। কাল রাত থেকেই কাশছে। জ্বরও আছে। থার্মোমিটার ধরলে একশ দুই টুই পাওয়া যাবে বলে ধারণা। আমি বলেছিলাম আজকের রেকর্ডিং শিডিউল বাতিল করতে, বুড়ো রাজি হয় নি।

বকর বকর কাশি নিয়ে গান-বাজনা করবে। কীভাবে?

গান তো করবে না। যন্ত্র বাজাবে।

কোন যন্ত্র— হাতে যেটা নিয়ে বসে আছে সেটা?

হুঁ।

খেলনা খেলনা মনে হচ্ছে।

বাজনা শুরু হলে বুঝবে খেলনা না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

এত ক্ষুদ্র যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়।
দেখিয়া জগতের লাগে পরম বিস্ময়।

খালা অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, হিমু তোর সঙ্গে একটা ব্যাপার ক্লিয়ার করে নেইআমি কিন্তু বক্তৃতা দেব না। হাতে ফুলটুলও তুলে দিতে পারব না। আচ্ছা দিতে হবে না।

তুই আবার কায়দা করে টাকা পয়সার ব্যাপারে আমাকে ফাঁসাবি না। আমি একটা পয়সাও দেব না।

আচ্ছা দিও না। তুই তো টাকা পয়সার জোগাড় করেছিস?

এখনো করি নি। তবে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এসো তোমার সঙ্গে ওস্তাদজীর পরিচয় করিয়ে দেই।

কোনো দরকার নেই। আমি কিন্তু দশ পনেরো মিনিট থেকেই চলে যাব। বাজনা ফাজনা আমার ভালো লাগে না। এখানে এসেছি। জানতে পারলেও তোর খালু রাগ করবে।

ঠিক আছে। চলে যেও।

ওস্তাদজীর পাশে যে মেয়েটা বসে আছে সে কে?

উনার মেয়ে। দেখতে সুন্দর না?

খুবই সুন্দর। মেয়েটাকে এত চিন্তিত লাগছে কেন?

জানি না। জিজ্ঞেস করে আসব?

তুই কী যে কথা বলিস। কী জিজ্ঞেস করবি?

জিজ্ঞেস করব যে, আমার খালা জানতে চাচ্ছেন–তুমি এত চিন্তিত কেন? তুই কি মেয়েটাকে চিনিস?

সামান্য চিনি। কোনো মেয়েকেই পুরোপুরি চেনা সম্ভব না। সেই চেষ্টাও করা উচিত না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই মেয়েদের পুরোপুরি চিনতেন। তাও দেশী মেয়ে না। বিদেশী মেয়ে।

তাই না-কি?

উনার গান শুন নি।

চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।

হিমু আমার সঙ্গে ফাজলামি করবি না। ওস্তাদজীর মেয়েটার কি বিয়ে হয়েছে?

হুঁ।

হাসবেন্ড কী করে?

ডাক বিভাগে কাজ করে।

মেয়েটার চুল সুন্দর না। কোঁকড়ানো চুলে মেয়েদের ভালো লাগে না। পার্লারে গিয়ে কোঁকড়ানো চুল ঠিক করা যায়।

মেয়েটার সঙ্গে কি কথা বলতে চাও?

কী উল্টাপাল্টা কথা বলছিস? আমি কী কথা বলব?

পার্লারে গিয়ে চুল ঠিক করার কথা বলবে।

হিমু তুই খুবই বিরক্ত করছিস। আমার সামনে থেকে যা। বাজনা ফাজনা কী করার শুরু কর, ঘড়ি ধরে দশ মিনিট থাকব। তারপর চলে যাব। আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধেও রাখতে পারবে না।

আমি ওস্তাদজীর কাছে গেলাম।

ওস্তাদজীর শরীর যতটা খারাপ ভেবেছিলাম, দেখা গেল শরীর তার চেয়েও খারাপ। চোখের মণি ছোট হয়ে গেছে এবং মণি চকচক করছে। হাত কাঁপছে। তার হাতে এক লিটারের পানির বোতল। একটু পর পর গ্লাসে পানি ঢেলে পানি খাচ্ছেন। ফুলফুলিয়া চিন্তিত গলায় বলল, বাবার শরীর বেশি খারাপ। উনার বিছানায় শুয়ে থাকা দরকার। শমসের উদ্দিন খাঁ সাহেব জ্বলজ্বলে চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, যন্ত্রণা করিস না। আমার যন্ত্রণা ভালো লাগে না।

ফুলফুলিয়া বলল, যন্ত্রণা আমারও ভালো লাগে না। আমি সারাজীবন তোমার যন্ত্রণা মুখ বুজে সহ্য করেছি। এখন তুমি কিছুক্ষণ আমার যন্ত্রণা সহ্য করবে।

তুই কী করবি?

আমি তোমাকে বাসায় নিয়ে যাব।

জোর করে বাসায় নিয়ে যাবি?

হ্যাঁ জোর করে বাসায় নিয়ে যাব।

খাঁ সাহেবের দুটা চোখ ধ্বক করে জ্বলে উঠল। তিনি স্টুডিওর সবাইকে চমকে এলিয়ে পড়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। নিজেকে সামলাবার জন্যে কিছুটা সময় নিল। তারপর শাড়ির আঁচল মাথায় তুলতে তুলতে সহজ গলায় বলল, বাবা রেকর্ডিং শেষ করে চলে এসো। আমি বাসায় যাচ্ছি।

খাঁ সাহেব থমথমে গলায় বললেন, রেকর্ডিং-এর সময় তুই থাকিবি না?

ফুলফুলিয়া বলল, না। আমি না থাকলে তোমার জন্যে ভালো আমার জন্যেও ভালো।

খাঁ সাহেব বললেন, যেখানে ইচ্ছা যা। আমি বাকি জীবন তোর মুখ দেখতে চাই না।

ফুলফুলিয়া কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল।

গল্প উপন্যাসে প্রায়ই পাওয়া যায়–এমন প্রচণ্ড চড় দেয়া হয়েছে যে গালে আঙুলের দাগ বসে গেছে। এই ব্যাপার বাস্তবে ঘটে না। বাস্তবে যা হয় তা হচ্ছে লাল হয়ে গাল ফুলে যায়। সমস্ত মুখে লাল আভা ছড়িয়ে যায়। যে গালে চড় দেয়া হয়েছে সে দিকের চোখ খানিকটা ছোট দেখা যায়। চোখে পানি ছলছল করতে থাকে। ফুলফুলিয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যাপারটা ঘটছে না। তার চোখে ছলছলানি নেই। বাবার চড় খেয়ে মেয়েটা হয়তো অভ্যস্ত।

আমি ফুলফুলিয়ার দিকে তাকিয়ে বললাম, বাসায় যাবে তো? এসো রিকশা করে। দিচ্ছি। ফুলফুলিয়া বিনা বাক্য ব্যয়ে উঠে এলো। তাকে নিয়ে রাস্তায় চলে এলাম। লোকজনদের কৌতূহলী চোখের আড়াল থেকে যত দ্রুত তাকে সরিয়ে দেয়া যায় ততই ভালো। রাস্তায় নেমে ফুলফুলিয়া বলল, ভাইজান আমি বাসায় যাব না। স্টুডিওর কোথাও লুকিয়ে থাকব যাতে বাবা আমাকে দেখতে না পান। বাবার বাজনা রেকর্ড হবে, আমি শুনব না–এটা কেমন কথা?

আমি বললাম, অবশ্যই তুমি শুনবে। তোমাকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করছি।

বাবার শরীরটা অসুস্থ। মেজাজও খারাপ। কাজেই বাবা আজ চমৎকার বাজাবে। শরীর খারাপ থাকলে এবং মেজাজ খারাপ থাকলে বাবা ভালো বাজায়।

তাই না-কি?

জ্বি। আপনি দেখবেন— এখানে যারা আছে। বাবা তাদের সবার আক্কেল গুড়ুম করে দেবেন।

তোমার গালগুড়ুম করে শুরু, শেষ হবে। আক্কেলগুড়ুমে। ফুলফুলিয়া শোন— চা খাবে? আমাদের চিফ সাউন্ড রেকর্ডিস্ট এখনো এসে পৌঁছায় নি। কাজেই হাতে সময় আছে। ফুলফুলিয়া ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনি আমার মন ভালো করার চেষ্টা করছেন। তার দরকার নেই। বাবার চড় খেয়ে আমার অভ্যাস আছে।

চড়ের পর চা খেতে কিন্তু খারাপ লাগে না। রাস্তার পাশের দোকানগুলি খুব ভাল চা বানায়। খেয়ে দেখ।

চলুন যাই।

ফুলফুলিয়া শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে দিয়েছে। আচল এমন সাবধানে গালের উপর টেনেছে যে ফুলে উঠা গাল দেখা যাচ্ছে না। তাকে বউ বউ লাগছে। ফুলফুলিয়া বলল, বাবার শরীর হঠাৎ কেন খারাপ করেছে জানেন?

আমি বললাম, না।

ফুলফুলিয়া বলল, আপনার জানার কথা না। বাবা পুরো ব্যাপারটা লুকিয়ে রেখেছে। আমি খুব কায়দা করে বের করেছি।

বল শুনি।

ফুলফুলিয়া ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাবা ঢাকা শহরের কোথায় যেন অসুস্থ একটা গাছ দেখেছেন। বাবা ঐ গাছকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন— গাছের অসুখটা যেন তার শরীরে চলে আসে। গাছ যেন বেঁচে যায়। এখন না-কি গাছের অসুখ তার কাছে চলে এসেছে। বাবার মাথা শুরু থেকেই খারাপ ছিল। যত দিন যাচ্ছে ততই খারাপ হচ্ছে।

সে-রকমই তো মনে হচ্ছে।

কিছু কিছু মানসিক রোগী আছে যাদের দেখে বোঝার উপায়ই নেই যে তারা মানসিক রোগী। সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। অসুখের খবরটা টের পাচ্ছে শুধু তাদের অতি কাছের মানুষজন।

তুমি নিশ্চিত তোমার বাবা একজন মানসিক রোগী?

হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। আমি আরো একটা ব্যাপার নিশ্চিত, সেটা কি বলব?

বলো।

অসুস্থ গাছের ব্যাপারটার সঙ্গে আপনার যোগ আছে। বাবার মাথায় জিনিসটা আপনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আপনার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা আছে কি-না। আমি জানি না, তবে মানুষের

মাথার ভেতর ঢুকে যাবার ক্ষমতা যে আছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমার কথাগুলি কি ঠিক?

ফুলফুলিয়ার দিকে আমি হাসিমুখে তাকালাম। ফুলফুলিয়া কঠিন গলায় বলল, আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট চলে এসেছে। এসো তাড়াতাড়ি যাই, তোমাকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করি।

দশ মিনিটের ভেতর খালার চলে যাবার কথা, তিনি যাচ্ছেন না। এখানকার কর্মকাণ্ডে মজা পেয়ে গেছেন। খাঁ সাহেবের মেয়ের গালে চড় মারাটা তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। কী কারণে মেয়ে চড় খেয়েছে এটা না জেনে তিনি নড়বেন না। প্রয়োজনে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবেন। খালা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, মেয়েটা চলে গেছে না কি?

আমি বললাম, না। লুকিয়ে আছে। বাবার বাজনা না শুনে সে নড়বে না।

এত লোকের সামনে এত বড় অপমান। তারপরও মেয়ে বসে আছে। তার কি আত্মসম্মান নেই?

আত্মসম্মানের চেয়ে বেশি আছে বাবার প্রতি মমতা।

কী জন্যে মেরেছে গুছিয়ে বল তো।

জানি না তো কী জন্যে মেরেছে।

অবশ্যই জানিস, তুই তো তখন আশেপাশেই ছিলি। কথাবার্তা শুনেছিস।

আশপাশে থাকলেও কিছু শুনতে পাই নি। হঠাৎ চড়ের শব্দ শুনলাম। তুচ্ছ কোনো কারণ হবে।

তুচ্ছ কারণ তো অবশ্যই না। তুচ্ছ কারণে এত লোকের সামনে এত বড় মেয়েকে বাবা মারে না। অবশ্যই জটিল কিছু আছে। আমি একটা সন্দেহ অবশ্যি করছি। শুনতে চাস?

চাই–কিন্তু এখন না। বাজনা শুরু হবে।

মেয়েটা কোথায় লুকিয়ে আছে?

রেকর্ডিং-এর কয়েকটা স্টুডিও আছে, ওর একটাতে লুকিয়ে রেখেছি। তুমি এক কাজ কর, তোমাকেও সেখানে লুকিয়ে রাখি। তুমি স্পাইয়িং করে ঘটনা বের করে ফেল।

তুই আমাকে ভাবিস কী? আমার কি স্পাইগিরি করা স্বভাব? আমি যদি ঐ ঘরে থাকি মেয়েটাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে থাকব। এত মানুষের সামনে অপমানিত হয়েছে। একটা মেয়ে মানুষ।

প্রফেশনাল একজন সভাপতিকে আসতে বলা হয়েছিল। (অবসরপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলরা রাজনীতিতে আসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত

শিক্ষকদের দৌড় এলেবেলে অনুষ্ঠানের সভাপতি পর্যন্ত।) গাড়ি না পাঠানোয় তিনি আসেন নি। তবে আমার টেলিফোনওয়ালা এসেছে। নিজের লোকের মতো ছাটোছুটি করে চা খাওয়াচ্ছে। পানি খাওয়াচ্ছে।

মাইক অনা হয়েছে। সাউন্ড রেকর্ডিস্ট ওকে সিগন্যাল দিয়েছে। লালবাতি জ্বলেছে। ওস্তাদ শমসের উদ্দিন খাঁ এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। আমি কাছে গিয়ে বললাম, কিছু বলবেন?

শমসের উদ্দিন বিব্রত গলায় বললেন, ফুলফুলিয়া কি সত্যি চলে গেছে? আমি বললাম, না। আপনার পাশের ঘরেই লুকিয়ে আছে। আপনার বাজনা না শুনে সে যাবে না।

শমসের উদ্দিন বললেন, আপনি কি দয়া করে আমার মেয়েটাকে বলবেন, সে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়। আমি অনেক অপরাধ অনেকবার করেছি, কখনো তার জন্যে ক্ষমা চাই নাই। আজ আমি আমার মেয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এইটা তাকে জানিয়ে আসুন, তারপর বাজনা শুরু করব।

আপনার মেয়েকে কিছু বলতে হবে না। মাইক অন করা আছে। আপনার কথা সবাই শুনতে পাচ্ছে।

ও আচ্ছা, ঠিক আছে।

আপনার কি শরীর বেশি খারাপ লাগছে?

শরীর খারাপ লাগছে। কিন্তু অসুবিধা নাই। বিসমিল্লাহ।

শমসের উদ্দিন খাঁ ব্যাঞ্জোর উপর ঝুঁকে পড়লেন। প্রথমে টুং করে একটা শব্দ হলো। তারপরে দুবার টুং-টাং! তারপরই মনে হলো টিনের চালে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। একেকবার দমকা হাওয়া আসছে বৃষ্টি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে— আবার ফিরে আসছে, আবার চলে যাচ্ছে। না, এখন আর বৃষ্টির শব্দ বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে শিকলপরা বন্দিনী রাজকন্যা কাঁদছে। তার কান্নার শব্দ আসছে একই সঙ্গে তার পায়ের শিকলের শব্দও আসছে। মায়া ধর্ম গ্রন্থে ঈশ্বর বলেছেন।–

হে পতিত মানবসন্তান। তোমরা ভুল জায়গায় আমাকে অনুসন্ধান করো না। আমাকে অনুসন্ধান করা সঙ্গীতে। আমি ছন্দময় সঙ্গীত। আমার সৃষ্টি ছন্দময় সঙ্গীত। আমার ধ্বংস ছন্দময় সঙ্গীত।

বাজনা শেষ হলো। ফুলফুলিয়ার ঘরে ঢুকে দেখি সে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। খালা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। আমাকে দেখেই খালা বললেন, ওস্তাদজীকে এ রকম মন খারাপ করা বাজনা বাজাতে নিষেধ করা। মেয়েটা কেঁদে অস্থির হচ্ছে। গান বাজনা মানুষকে আনন্দ দেবার জন্যে। কাদাবার জন্যে তো না। তুই এক্ষুণি গিয়ে উনাকে আমার কথা বলে নিষেধ করবি। আমার কথা উনাকে শুনতে হবে। আমি প্রডিউসার। টাকা আমি দিচ্ছি।

টাকা তুমি দিচ্ছ?

অবশ্যই। কত টাকা দিতে হবে বল। চেক বই সঙ্গে আছে। চেক লিখে দিচ্ছি। বাজনার দ্বিতীয় অংশ শুরু হয়েছে। ফুলফুলিয়ার কান্না থেমেছে। সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে আছে। যেন সে এই ভুবনে নেই। তার যাত্রা শুরু হয়েছে। অন্য কোনো ভুবনের দিকে। খালার

চোখে পানি টলমল করছে। আমার সামনে তিনি যদি চোখের পানি ফেলেন তাহলে খুব লজ্জায় পড়বেন। আমি ঘরের বাইরে চলে এলাম।

হে মানবসন্তান আমি নানান রূপে তোমাদের সামনে নিজেকে উপস্থিত করেছি। চোখ মেললেই আমাকে দেখবে। কান পাতিলেই আমাকে শুনবে। কেন তোমরা চোখ ও কান দুই-ই বন্ধ করে রেখেছ?

৭. হিমু ভাইজান

হিমু ভাইজান,

এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবে কি-না। আমি বুঝতে পারছি না। আমার হাতে এখন কোনো টাকা-পয়সা নেই। চিঠিটা লিখে খামে ভরে, খামের উপর তোমার মেসের ঠিকানা লিখে এক মুদির দোকানির হাতে দিয়েছি। সে যদি পাঠায় তাহলে হয়তো পাবে। মুদি দোকানির চেহারাটা সরল টাইপ। সে বিনে পয়সায় আমাকে একটা গায়ে মাখা সাবান দিয়েছে। তার দেয়া সাবান দিয়ে অনেক দিন পর সাবান মেখে গোসল করেছি। দোকানির নাম কুদ্দুস মিয়া। বাড়ি রংপুর। বিয়ে করেছে খুলনায়। এই চিঠি তোমার হাতে পৌছবে এটা ভেবেই লিখছি। শুরুতে আমার খবর সব দিয়ে নেই।

প্রথম খবর আমি নর্থ বেঙ্গল হাঁটা শেষ করেছি। এখন আছি। যমুনা নদীর পড়ে। পা ফুলে গেছে বলে হাঁটতে পারছি না। এক দুদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু করব। ঠিক করেছি। ঢাকা হয়ে যাব। আমাকে দেখলে এখন তুমি চিনতে পারবে না। দাড়ি গোঁফ গজিয়ে বিন লাদেনের মতো চেহারা হয়ে গেছে। শরীরের রঙও জ্বলে গেছে। আয়নায় নিজেকে দেখে খুবই মজা লাগে। সমুদ্রে ডুব দিয়ে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে ফেলব বলেছিলাম— এখন আর কামাতে ইচ্ছা! করছে না। মায়া পড়ে গেছে। দাড়ির জন্যে একটা অসুবিধা শুধু হচ্ছে। উকুন। চিরুনি দিয়ে আচড়ালেই পুট পুট করে উকুন পড়ে। মাথার চুলের উকুন এবং দাড়ির উকুন কিন্তু আলাদা। দাড়ির উকুন সাইজে ছোট, একটু সাদাটে রঙ আছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত কোনো গবেষণা হয়েছে কি-না কে জানে। গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

দাড়ির উকুন মাথায় যায় না। মাথার উকুন দাড়িতে আসে। না। তাদের সীমানা নির্দিষ্ট। যেন উকুনরা দুটা আলাদা দেশের অধিবাসী। কেউ বর্ডার ক্রস করে না।

দ্বিতীয় খবর, এই খবরটা মজার। চুল দাড়ির কারণে অনেকেই আমাকে পীর ফকির ভাবতে শুরু করেছে। কোনো বাড়িতে খেতে চাইলে আগ্রহ করে খাওয়াচ্ছে। গত বুধবার রাতে কী হয়েছে শুনলে তুমি খুবই মজা পাবে। আমি এক বাড়িতে রাতে থাকার জন্যে জায়গা চেয়েছি, তারা সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাঘরে আমার থাকার জায়গা দিয়েছে। গোসল করার জন্যে গরম পানি। যেন অনেক দিন পরে বাড়িতে মেহমান এসেছে। গোসল শেষ করে। খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমুতে যাব এমন সময় চার-পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে কোলে নিয়ে তার বাবা-মা উপস্থিত। বাচ্চাটা পেটের ব্যথায় চিৎকার করে কাঁদছে। বাবা মা চাচ্ছে। আমি যেন মেয়েটার পেটে একটা ফুঁ দিয়ে দেই। চিন্তা কর কী অবস্থা। আমাকে কে ফুঁ দেয়। তার নাই ঠিক। শেষে দাঁত মুখ খিচিয়ে দিলাম। একটা ফু। আমার দাঁত মুখ খিচানো দেখে মেয়েটা হয়তো ভয় পেয়েছে। ভয়েই তার ব্যথা কমে গেল। মেয়ের বাবা-মা যত না অবাক আমি তার চেয়েও অবাক। মেয়ের বাবা একটা বিশ টাকার নোট আমাকে দিতে গেল। আমি গম্ভীর গলায় বললাম–টাকা দিয়ে কী হয়? টাকা দিয়ে তুমি কি চাঁদের আলো কিনতে পারবে? খুবই ফিলসফি মার্কা কথা। নিজের কথা শুনে আমি নিজেই মুগ্ধ! ঐ বাড়ি থেকে মোটামুটি আমি একজন পীর সাহেব হিসেবে বের হলাম। বাড়ির মানুষ খুবই অবাক, যখন আমি সকালের নাশতা খেলাম না। আমি বললাম, দিনে আমি কিছু খাই না। সূর্য ডোবার পর একবেলা খাই। ঘটনা অবশ্যি এ রকমই। ভরপেটে হাঁটতে কষ্ট হয়। তবে ঐ বাড়ির লোকজন ভেবেছে আমি সারাদিন রোজা রাখি। আমি কারো ভুল ভাঙ্গাচ্ছি না। নিজেকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পীর ভাবতে ভালো লাগছে। কেউ যখন আমার পরিচয়

জিজ্ঞেস করে তখন বলি–পরিচয় তো ভাই জানি না। পরিচয়ের খোঁজেই পথে পথে হাঁটছি। খুবই উচ্চমার্গের কথা।

এখন তোমাকে জরুরি একটা কথা বলি। ফুলফুলিয়ার সঙ্গে তোমার কি কোনো যোগাযোগ আছে? এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম ফুলফুলিয়ার বাবা খুবই অসুস্থ। তাকে খোলা মাঠে শুইয়ে রাখা হয়েছে। গাছের পাতা দিয়ে তার সারা শরীর ঢাকা। ফুলফুলিয়া পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিজেকে বোরকায় ঢেকে বাবার চারদিকে ঘুরছে। স্বপ্নটা দেখে আমার খুব মন খারাপ হয়েছে। যদিও জানি স্বপ্ন কোনো ব্যাপার না। সারাক্ষণ ফুলফুলিয়ার কথা ভাবি বলেই এমন স্বপ্ন দেখছি।

ভাইজান, আমি তোমাকে নিয়েও একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম পুলিশ এসে তোমাকে ধরেছে এবং জেলখানায় নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের হাতে ধরা খাওয়া তোমার জন্যে নতুন কিছু না। প্রায়ই তো তুমি থানা হাজতে রাত কাটাও। আমি এটা নিয়ে ভাবছি না। শুধু ফুলফুলিয়ার স্বপ্নটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা লাগছে। ভাইজান শোন, ঢাকায় এসে আমি যদি ফুলফুলিয়ার সঙ্গে দেখা করি। সেটা কি খুব খারাপ হবে? তুমি যা বলবে তাই করব।

তুমি ভালো থেকো।

৮. হ্যান্ডস আপ

ভোর পাঁচটায় পুলিশ আমাকে এ্যারেস্ট করল। টিভি নাটকের মতো দৃশ্য। একজন পুলিশ অফিসার পিস্তল হাতে ঢুকলেন। তাঁর পিছনে দুই দুবলা পুলিশ। রাইফেলের ভারে মাথা ঘুরে যে-কোনো সময় পড়ে যাবে এমন অবস্থা। পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকেই হুঙ্কার দিলেন– হ্যান্ডস আপ।

আমি বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললাম, স্যার ভালো আছেন?

পুলিশ অফিসার আগের মতোই হুঙ্কার টাইপ গলায় বললেন, ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট।

কিছু কিছু বাক্য আছে ইংরেজিতে না বললে ভালো শুনায় না। ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট এরকম একটি বাক্য। বাংলায় যদি বলা হয়, তোমাকে গ্রেফতার করা হলো। তা হলে পানশে শুনাবে। হুমকি ধমকির জন্য এবং কুকুরের সঙ্গে কথা বলার জন্যে ইংরেজি ভাষার কোনো তুলনা হয় না।

পুলিশ অফিসার এখনো পিস্তল উচিয়ে আছেন। ভাবখানা এরকম যে আমি ভয়ঙ্কর কোনো সন্ত্রাসী। আমার নাম হিমু না। আমার নাম মুরগি হিমু কিংবা সুইডেন হিমু।

স্যার আমার অপরাধটা কী?

সেটা থানায় গিয়ে জানবে। ততক্ষণে দুবলা পুলিশের একজন আমার হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়েছে। কোমরে দড়ি বাঁধার চেষ্টা করছে। গিট দিতে পারছে না। আসামির কোমরে দড়ির গিট দেয়ার বিশেষ পদ্ধতি আছে। আন্ধা গিন্টু দিলে হবে না।

স্যার দুটা মিনিট সময় যদি দেন। বাথরুমে যাবার প্রয়োজন ছিল।

অ্যাগে থানায় চল। তারপর বাথরুম। বদমায়েশ কোথাকার!

কোমরে দড়িবাঁধা অবস্থায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। অন্য একজন পুলিশ আমার বিছানা উল্টাচ্ছে। চৌকির নিচে উকিঝুকি দিচ্ছে। পুলিশ অফিসার চোখে কী একটা ইশারা করলেন— আমি আমার বালিশ ছুড়ে তুলা বের করে চারদিক ছড়িয়ে দিল।

মেসের লোকজন। এরমধ্যে খবর পেয়ে গেছে। তারা সবাই বারান্দায় ভিড় করেছে। পুলিশ অফিসার তাদের দিকে তাকিয়েও হুঙ্কার দিলেন— ভিড় করবেন না। খবরদার ভিড় করবেন না। তার হাতে এখনো পিস্তল ধরা। মনে হচ্ছে তিনি টিভি প্যাকেজ নাটকের অভিনতা। দুর্দান্ত পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। পরিচালকের নির্দেশে প্রতিটি ডায়ালগ পিস্তল নাচিয়ে বলতে হচ্ছে।

অনুসন্ধান করে কিছু পাওয়া গেল না। পুলিশ অফিসার ছোটখাট একটা প্রসেশন করে আমাকে নিয়ে গাড়িতে তুললেন। তাঁর মুখে বিমলানন্দ। মনে হয় এই প্রথম তিনি কাউকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পেয়েছেন। আজ রাতে স্ত্রীর সঙ্গে মজা করে। গল্প করবেন–জীবনবাজি রেখে এ্যারেষ্ট করেছি। অন্ধকার থাকতেই ক্রিমিন্যাল কর্ডন করে ফেললাম। দরজা ভেঙে কেউ ঢুকতে চায় না। রিসকি ব্যাপার তো। এরা বিছানার পাশে

কাটা রাইফেল নিয়ে ঘুমায়। এদের হাতের নিশানাও থাকে ভালো। কেউ যখন দরজা ভাঙতে রাজি হচ্ছে না। তখন আমিই এগিয়ে গেলাম। হাতে খোলা পিস্তল নিয়ে দরজা ভেঙে হারামীটার উপর লাফিয়ে পড়লাম। সে তোষকের নিচে রাখা কাটা রাইফেলে হাত দিয়ে ফেলেছিল— তার আগেই হাতে হ্যান্ডকাফ।

পুলিশ অফিসারের স্ত্রী এই পর্যায়ে ভীত গলায় বলবে— আগ বাড়িয়ে তোমার সাহস দেখানোর দরকার কী? অতিরিক্ত সাহসের জন্যেই তুমি একদিন বিপদে পড়বে। খবরদার আর কখনো তুমি এমন ভয়ঙ্কর অপরাধীকে ধরতে যাবে না। এ ধরনের ভয়ঙ্কর ক্রিমিনালদের ধরার জন্যে তুমি ছাড়া কি আর লোক নেই? এদের ধরার বেলাোয়েই শুধু তোমার ডাক পড়ে কেন?

আমাকে গ্রেফতার করেছেন মোহাম্মদপুর থানার সেকেন্ড অফিসার। তিনি আমাকে থানায় জমা দিয়ে আরেকজন কাকে যেন গ্রেফতার করতে গেলেন। আমি থানার ওসি সাহেবের কাছ থেকে জানতে পেলাম আমার অপরাধ গুরুতর। ভোর পাঁচটার সময় আব্দুর রহমান নামের এক লোক ব্যাগে দশ হাজার টাকা নিয়ে হেঁটে হেঁটে কাওরান বাজারের দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় ধারালো ক্ষুর হাতে আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। তাকে আহত কয়ে ব্যাগ নিয়ে ছুটে পালানোর সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ি। পুলিশ। হ্যান্ডব্যাগ, টাকা এবং রক্তাক্ত ক্ষুর উদ্ধার করেছে এবং আমাকে এ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে এসেছে।

আমি ওসি সাহেবকে বললাম, মামলাটা ভালো সাজাতে পারেন নি। ভোর পাঁচটায় কেউ দশ হাজার টাকা নিয়ে হেঁটে হেটে কাওরান বাজার যাবে না। দিনকাল খারাপ। স্যার

আপনি এক কাজ করুন–টাকার পরিমাণ কমিয়ে দিন। চারশ টাকা করে দিন। অনেক বিশ্বাসযোগ্য হবে। চারশ টাকার জন্যেও খুন হয়।

ওসি সাহেব বললেন, আপনার কাছে তো পরামর্শ চাচ্ছি না।

পুলিশ এত দুর্বলভাবে মামলা সাজাচ্ছে–ভাবতেই খারাপ লাগছে। পুলিশ মামলা সাজানোর পরও তাতে ফাঁক থাকবে তা কেমন করে হয়? আব্দুর রহমান সাহেবের শরীরে ক্ষুরের দাগ আছে তো? নাকি তাও নেই।

বেশি কথা বলবেন না।

জ্বি আচ্ছা, বেশি কথা বলব না।

আপনার বিরুদ্ধে যে চার্জ আনা হয়েছে আপনি কি তা অস্বীকার করতে চান।

সবই স্বীকার করছেন?

অবশ্যই। শুধু দশ হাজার টাকাটা বাদ। টাকার পরিমাণটা কমাতে হবে। টাকাটা কমিয়ে চারশতে নিয়ে আসুন।

ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে স্টেটমেন্ট দেবেন?

জ্বি দেব।

চা খাবেন না-কি?

জ্বি স্যার চা খাব। সকালে নাশতাও খাই নি।

চা-নাশতার ব্যবস্থা করছি। আপনি জেনেশুনে মিথ্যা স্টেটমেন্ট দিতে চাচ্ছেন কেন?

আপনারা চাচ্ছেন, কাজেই আমি চাচ্ছি। আমি স্টেটমেন্ট দিতে রাজি না হলে তো মারধর করে রাজি করবেন। খামাখা মার খেয়ে লাভ কী?

ভালো লজিক। হিমু সাহেব শুনুন –উপরের নির্দেশে আমাদেরকে মাঝে মাঝে কিছু অন্যায় করতে হয়।

খারাপ লাগে না।

প্রথম দুই বছর খারাপ লাগে, তারপর আর খারাপ লাগে না। অভ্যাস হয়ে যায়। মানুষ অভ্যাসের দাস। আপনার চাকরি কত দিন হয়েছে?

পাঁচ বছর।

অনেক দিন তো হয়ে গেল। আপনার খারাপ লাগার কথা না। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার খারাপ লাগছে। খারাপ লাগছে কেন?

ওসি সাহেব জবাব দিলেন না। ফাইলপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

আমি ওসি সাহেবের দিকে ঝুকে এসে বললাম, যে আব্দুর রহমান সাহেবের গায়ে ক্ষুর দিয়ে আমি টান দিয়েছি, তার সঙ্গে কি কথা বলতে পারি?

না।

না কেন?

সে গুরুতর আহত। হাসপাতালে আছে। জ্ঞান নেই।

মরে যাবে না তো?

মরে যেতেও পারে। অবস্থা ভালো না।

মরে গেলে তো আমি খুনের দায়ে ফেঁসে যাব।

তা যাবেন।

ফাঁসিতে ঝুলতে হবে?

ওসি সাহেব ফাইল থেকে মুখ তুলে আমাকে আশ্বস্ত করার মতো গলায় বললেন, ফাঁসি হবে না। প্রত্যক্ষদর্শী কেউ নেই। যাবজীবন হবে। এখনো ভেবে বলুন। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে স্টেটমেন্ট দেবেন? আমার উপর নির্দেশ আছে আপনাকে কোনো কঠিন মামলায় ফাঁসানো। যাতে চার-পাঁচ বছর আপনি জেলে থাকেন। আমি সেই ব্যবস্থা ভালোমতো করেছি।

প্রমোশন নিশ্চয়ই পাবেন?

ওসি সাহেব সরু চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সিগারেট টানতে লাগলেন। তাকে সামান্য চিন্তিত মনে হলো।

সকাল দশটায় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে লিখিত স্টেটমেন্টে দস্তখত করলাম। অল্পবয়েসী ম্যাজিস্ট্রেট। বিসিএস পাশ করে সদ্য জয়েন করা তরুণ। সে আমার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় বলল, তুমি যখন মানুষটাকে ক্ষুর দিয়ে পোচ দিচ্ছিলে তখন তোমার একটুও খারাপ লাগে নি?

আমি হাসি মুখে বললাম, জ্বি না। স্যার।

একবারও ভাবলে না লোকটা মরে যেতে পারে?

মরে তো সবাই যাবে। মানুষ মরণশীল।

মানুষ মরণশীল। এই ফ্রেজিও জান?

জ্বি জানি।

পড়াশোনা কতদূর?

পড়াশোনা বেশিদূর না। আমি স্বশিক্ষিত।

শিক্ষা তো ভালোই পেয়েছ। মানুষ মেরে ব্যাগ নিয়ে দৌড় দিয়েছ। এই শিক্ষা কার

কাছে পেয়েছ?

এই শিক্ষা স্যার পুলিশের কাছ থেকে পেয়েছি। শিক্ষক হিসাবে পুলিশ খারাপ না।

মাস্তান হয়েছ না?

মাস্তান হওয়া তো স্যার খারাপ কিছু না। মাস্ত থেকে মাস্তান। মাস্ত মানে হলো মত্ত। ঈশ্বরপ্রেমে যে মত্ত সে মাস্ত। সেই মাস্ত থেকে মাস্তান। মাস্তান হতে পারা ভাগ্যের ব্যাপার।

তোমার গলার কাছে ফাঁসির দড়ি ঝুলছে এটা জানো? ফাঁসির দড়ি তো স্যার সবার সামনেই বুলিছে। আপনার সামনেও ঝুলছে। ওসি সাহেবের সামনেও ঝুলছে। তবে আপনাদের দড়ি দৃশ্যমান না। দেখা যাচ্ছে না। আমারটা দেখা যাচ্ছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, যাকে তুমি ক্ষুর দিয়ে আহত করেছ সে অজ্ঞান অবস্থায় আছে। জ্ঞান যদি কিছুক্ষণের জন্যে ফেরে তাহলে তার ডেথ বেড স্টেটমেন্ট নেব। ডেথ বেড কনফেসনের ওপর ফাঁসি হয়ে যায়–এটা জানো?

জানতাম না। এখন জানলাম।

কেমন লাগছে জেনে?

ভালো লাগছে এই ভেবে যে মৃত্যুর ঠিক আগে বলা কথার উপর আপনারা গুরুত্ব দিচ্ছেন। মৃত্যুপথ যাত্রীকে সম্মান দেখাচ্ছেন। যদিও এটা করা ঠিক না।

কেন ঠিক না?

মৃত্যুর আগে মানুষের মাথা এলোমেলো থাকে। চিন্তা-ভাবনা লজিক সব পাল্টে যায়। সেই সময়ের কথার কোনো গুরুত্ব থাকা উচিত না। আমার বাবা মৃত্যুর সময় আমাকে বলেছিলেন–হিমু, তোর মা আমাকে নিতে এসেছে। তোর পাশের চেয়ারে বসে আছে। সে এত রেগে আছে কেন বুঝতে পারছি না। এখন স্যার আপনি বলুন যে লোক এই কথা বলছে তার কোনো কথার কি গুরুত্ব দেয়া উচিত?

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চোখ মুখ কুঁচকে বলবেন, তোমার মতো ক্রিমিনালের সঙ্গে এইসব আলাপ করার কোনো ইচ্ছা নেই। শুধু জেনে রাখ— তোমার খবর আছে।

আপনিও জেনে রাখুন। স্যার। আমাদের সবারই খবর আছে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চলে যাবার পরপরই পত্রিকার রিপোর্টাররা এলো। পুলিশের এত বড় সাফল্য। ভয়ঙ্কর একজন ক্রিমিন্যালকে ক্ষুর হাতে ধরে ফেলেছে। খবরটা পত্রিকায় যাবে। আমাকে একটা রক্তমাখা ক্ষুর দেয়া হলো। সেই ক্ষুর হাতে নিয়ে আমি দাঁড়ালাম। আমার পাশে খোলা পিস্তল হাতে সেকেন্ড অফিসার দাঁড়ালেন। ছবি তোলা হলো। ছোটখাট ইন্টারভ্যু হলো। রিপোর্টার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? আমি বললাম। আমার নাম–হিমু।

শুধু হিমু?

জ্বি না–চন্দ্র হিমু। বেশির ভাগ সময় চাঁদে বাস করি বলে চন্দ্র হিমু।

সকালের নাস্তা খেয়ে আমি দুপুর পর্যন্ত হাজতে ঘুমালাম। ঘুম থেকে উঠে আরাম করে দুপুরের খাবার খেলাম। ওসি সাহেবের জন্যে বাসা থেকে টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার এসেছিল। তিনি ডিউটিতে যাবেন। সেখানেই দুপুরের খাবার খাবেন বলে টিফিন কেরিয়ার তিনি আমাকে দিয়ে গেলেন। চারটা বাটিতে অনেক আয়োজন। করলা ভাজি, কচুর মুখির ভরতা, ইলিশ মাছের ঝোল, লাল লাল করে ভাজা ছোট চিংড়ি। টিফিন কেরিয়ারের প্রথম বাটিতে পলিথিনে মোড়া একটা চিঠিও পাওয়া গেল। ওসি সাহেবের মেয়ের লেখা চিঠি।

বাবা,

চিংড়ি মাছের ভাজা আমি রান্না করেছি। মা শুধু মশলা মাখিয়ে দিয়েছে। চিংড়ি মাছটা প্রথম খাবে। প্রথমে চিংড়ি মাছ না খেয়ে অন্য কিছু খেলে আমি খুব রাগ করব। বাবা তুমি জানো চিংড়ি মাছ কিন্তু মাছ না— পোকা। চিংড়ি মাছের গু থাকে মাথায়। এটা কি জানো? এটা আমাকে বলেছে রহিমা বুয়া।

তবে সে খুব মিথ্যা কথা বলে। আর চিংড়ি মাছ যে পোকা এটা বলেছে মা। চিংড়ি মাছ যদি পোকা হয় তাহলে আমরা কেন চিংড়ি মাছ বলি? আমরা কেন চিংড়ি পোকা বলি না? বাবা এখন তোমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি।

বলো তো

তিন অক্ষরে নাম তাঁর
বৃহৎ বলে গণ্য
পেটটি তাহার কেটে দিলে
হয়ে যায় অন্ন।

এটা কী? একটু চিন্তা করলেই পারবে। এই জিনিসটা তুমি আজ খাবে। জিনিসটার রঙ সাদা।

আজ এই পর্যন্ত। এবার তাহলে (৭০+১০)। তুমি ভালো থেকে। কেমন?

তোমার আদরের মেয়ে

Pয়াল

দুপুরে খাবার পর আরেকবার লম্বা ঘুম দিলাম। ঘুম ভাঙলো সেন্ট্রি পুলিশের ডাকাডাকিতে। আমাকে মেডিকেল কলেজে যেতে হবে। আবদুর রহমানের জ্ঞান ফিরেছে। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তাঁর সামনে আমাকে হাজির করা হবে। আব্দুর রহমান সাহেব আমাকে দেখে বলবেন— আমিই সেই ব্যক্তি কিনা। ওসি সাহেব নিজেই আমাকে নিয়ে যাবেন। আমি তাকে তার কন্যা পিয়ালের চিঠির কথা বললাম। তিনি চুপ করে রইলেন। মনে হলো খুবই চিন্তিত। আমি বললাম, এত চিন্তিত কেন?

ওসি সাহেব বললেন, আপনাকে নিয়ে চিন্তিত। আপনি ঠিকই বলেছিলেন। মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। আপনাকে নিয়ে যখন তার সামনে হাজির করা হবে, ম্যাজিস্ট্রেট যখন বলবে–এই কি সেই ব্যক্তি? আব্দুর রহমান অবশ্যই বলবে, হুঁ। কিছু না বুঝেই বলবে। আগে এ রকম দেখেছি। নিরাপরাধ লোক হাজির করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞেস করেছে— এই কি আপনাকে গুলি করেছিল? গুলি খাওয়া মানুষ সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, জ্বি।

নিরাপরাধ মানুষটাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছে?

হুঁ।

আমি ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি এত চিন্তিত হবেন না। ফাঁসিতে বুলতে হলে বুলিব। এতে আপনার নাম ফাটবে। উপরওয়ালার নির্দেশে এমন মামলা সাজানো হয়েছে যে পাঁচ বছর জেলে থাকার বদলে ফাঁসিতে ঝুলে পড়তে হয়েছে।

ওসি সাহেব। আবারো বললেন, হুঁ।

আমি বললাম, একটা সিগারেট দিন। ধুয়া ছাড়তে ছাড়তে যাই।

ওসি সাহেব সিগারেটের প্যাকেট বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, প্যাকেটটা রেখে দিন।

আব্দুর রহমান পুলিশ পাহারায় হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন। তাকে ঘিরে আছে আত্মীয়স্বজন। তিনি কাউকে চিনতে পারছেন বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর নাকে অক্সিজেনের নল। মাথার ওপর স্যালাইনের বোতল ঝুলছে। একটা হাত উঁচু করে বাঁধা।

ভদ্রলোক হা করে আছেন। নাক দিয়ে স্যালাইন দেয়া হলেও তিনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন মুখে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। তার বুকে ব্যান্ডেজ। সেই ব্যান্ডেজ রক্তে ভিজে লাল হয়ে আছে।

সকালের তরুণ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আবদুর রহমানের পাশেই চেয়ারে বসে আছেন। তার হাতে ফাইলপত্র। তিনি আমাকে দেখিয়ে উঁচু গলায় বললেন, চাচামিয়া একে চিনতে পারছেন? আব্দুর রহমান মাথা নাড়লেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, মাথা নাড়লে হবে না। মুখে বলতে হবে, হ্যাঁ। বলুন হ্যাঁ।

আব্দুর রহমান বললেন, হ্যাঁ।

এই লোকটা কি আপনাকে ক্ষুর দিয়ে ফালা ফালা করেছে?

আব্দুর রহমান আবারো হাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, মাথা নাড়লে হবে না। মুখে হ্যাঁ বলুন।

আব্দুর রহমান বললেন, হ্যাঁ।

আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললাম, স্যার উনার যে অবস্থা। আপনি উনাকে যাই জিজ্ঞেস করুন। উনি মাথা নাড়বেন। হ্যাঁ বলতে বললে বলবেন–হ্যাঁ। আপনি উনাকে জিজ্ঞেস করুন— গরু কি আকাশে উড়তে পারে? উনি বলবেন–হ্যাঁ।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার খালু সাহেবের মতো ইংরেজিতে আমাকে যা বললেন তার সরল বাংলা হলো— আমি কী জিজ্ঞেস বাঁ করব না। সেই বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত নেব। তোমার কাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা, তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে।

আমি বললাম, জ্বি আচ্ছা স্যার।

আব্দুর রহমান সাহেবের আত্মীয়স্বজনরা এক দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। তাদের কারো চোখে ভয়, কারো চোখে ক্রোধ, কারো চোখে তীব্র ঘৃণা। শুধু একটা পাঁচ ছ বছরের বাচ্চা মেয়ের চোখে প্রবল বিস্ময়। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, খুঁকি তোমার কী নাম? মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমার নাম উর্মি। আমি ক্লাস টুতে পড়ি।

আমি বললাম, ক্লাস টু খায় গু।

ঊর্মি ফিক করে হেসে ফেলল। বয়স্ক একজন মহিলা ধাক্কা দিয়ে ঊর্মিকে আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিলেন।

৯. ভালো থাকুক সমগ্র মানব জাতি

ওসি সাহেবের ঘরে আমি বসে আছি। আমার সামনে ফুলফুলিয়া। সে আমাকে দেখতে এসেছে। ওসি সাহেব ভদ্রতা করে ফুলফুলিয়াকে তাঁর ঘরে বসিয়েছেন। আমাকে হাজত থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন। আমরা দুজন যেন নিরিবিলি কথা বলতে পারি। তার জন্যে নিজে ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে চলে গেছেন। আমার হাতে হাতকড়া নেই, কোমরে দড়ি নেই। সকালে দাড়ি শেভ করার জন্যে ওসি সাহেব ডিসপোজেবল শেভার এবং শোভিংক্রিম পাঠিয়েছিলেন। খাওয়া-দাওয়া তাঁর বাসা থেকেই আসছে। আজ দুপুরের পর আমাকে থানা হাজত থেকে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। ওসি সাহেবের সমস্যার সমাধান। বেচারা খুবই লজ্জার মধ্যে পড়ে গেছেন। কেইস সাজানো এত নিখুঁত হবে সেটা মনে হয়। ভবেন নি।

তারপর ফুলফুলিয়া কেমন আছ?

ফুলফুলিয়া জবাব দিল না। চেয়ারে বসা ছিল। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানোর ব্যাপারটা তরুণী মেয়েদের মধ্যে নেই।

আমি যে হাজতে আছি খোঁজ পেলে কী করে?

সব পত্রিকায় আপনার ছবি ছাপা হয়েছে। আপনি ক্ষুর হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার হাতে হাতকড়া পরানো। আপনার সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসার। তার হাতে পিস্তল।

ছবিটা সুন্দর হয়েছে?

খুব ভালো হয়েছে। কোনো খুনি আসামি ক্ষুর হাতে এমন হাসিমুখে ছবি তুলে না। আপনার মুখ ভর্তি হাসি। এই ঝামেলায় আপনি ইচ্ছা করে জড়িয়েছেন, তাই না?

মানুষ ইচ্ছা করে ঝামেলায় জড়াতে চায় না।

ভুল বললেন। প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষই ইচ্ছা করে ঝামেলায় জড়ায়। মানুষ ঝামেলা পছন্দ করে।

ফুলফুলিয়া দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোস।

ফুলফুলিয়া বসল। আমি বসলাম তার পাশে এবং মুগ্ধ হয়ে তাকালাম। ফুলফুলিয়াকে আজ ইন্দ্রাণীর মতো লাগছে। আজ যে তার সাজাগোজের পরিবর্তন হয়েছে তা না। তার বাবার বাজনা রেকর্ডিং-এর দিন যে শাড়ি পরা ছিল সেই শাড়িটিই সে পরেছে। চোখে কাজল দেয় নি বা মুখে পাউডার দেয় নি। মেয়েদের এই একটি বিশেষ ব্যাপার আছে–দিনের কোনো কোনো সময়ে তাদের ইন্দ্রাণীর মতো লাগে।

ফুলফুলিয়া বলল, বাবার সিডিটা বের হয়েছে। আপনি অসাধারণ একজন মানুষ। সত্যি সত্যি সিডি বের করেছেন?

কই দেখি কেমন হয়েছে।

আমি আনি নি। বাবার ইচ্ছা সিডিটা উনি নিজে আপনার হাতে দেবেন।

উনি কেমন আছেন?

ভালো না।

ভালো না মানে কি?

তিনি কারো সঙ্গেই কথা বলছেন না। ডাক্তাররা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না।

তাকে কি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে?

জি। হাসপাতালের বেডে তিনি হাত-পা সোজা করে লম্বা হয়ে পড়ে থাকেন। কারো কোনো প্রশ্নের জবাব দেন না।

তোমার কথারও জবাব দেন না?

না। শুধু গতকাল রাতে অতীশ দীপংকর রোডের রাধাচুড়া গাছটার কথা বললেন। গাছটা দেখে আসতে বললেন।

তুমি নিশ্চয়ই গাছ দেখতে যাও নি?

না, আমি যাই নি। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে খুব হাস্যকর লাগছে। একটা মানুষ তার নিজের জীবন গাছকে দিয়ে সে গাছ হয়ে যাবে। একজন উন্মাদও তো এভাবে চিন্তা করবে না।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, তোমার বাবা গাছ হয়ে গেলে তোমার জন্যই তো সুবিধা।

ফুলফুলিয়া অবাক হয়ে বলল, আমার জন্যে কী সুবিধা?

তোমাকে আগলে আগলে রাখবেন না। তোমার সঙ্গে যাতে কোনো তরুণের পরিচয় না হয় তার জন্যে আগ বাড়িয়ে বলবেন না যে আমার মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে। তার স্বামী থাকে নাইক্ষ্যংছড়ি।

ফুলফুলিয়া এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পলকহীন মাছের দৃষ্টি। আমি বললাম, যতদিন তোমার বাবা বেঁচে থাকবেন ততদিন তোমার জীবন শুরু হবে না।

একজন মানুষের মৃত্যুর ব্যাপার আপনি এত সহজে বলতে পারলেন?

হ্যাঁ পারলাম।

আপনি পাথরের মতো মানুষ, এটা জানেন?

জানি।

যদি আপনার ফাঁসি হয় আপনি কি হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় দিতে পারবেন?

চেষ্টা অবশ্যই করব। পারব কি-না বুঝতে পারছি না।

চেষ্টা কেন করবেন? আপনি আলাদা, আপনি অন্যদের মতো না, এটা প্রমাণ করার জন্যে?

আমরা কেউ তো কারো মতো নাই। আমরা সবাই আলাদা।

আমার বিয়ে হয় নি। বিয়ের কথা মিথ্যা করে বলা হচ্ছে –এই তথ্য আপনাকে কে দিল? বাবা দিয়েছেন?

না। আমি নিজেই চিন্তা করে বের করেছি।

কবে বের করেছেন?

যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হলো সেদিন।

এতদিন বলেন নি কেন?

তোমরা পিতা-কন্যা একটা খেলা খেলছ, আমি খেলাটা নষ্ট করি নি।

আজ হঠাৎ খেলাটা নষ্ট করলেন কেন?

খেলা নষ্ট করলাম। কারণ–জহির ঢাকায় আসছে। তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। আমি চাই তোমরা ঝামেলা সেরে ফেল।

কী ঝামেলা?

বিয়ের ঝামেলা।

আপনি অবলীলায় এইসব কথা কীভাবে বলছেন?

দীর্ঘদিনের অভ্যাস। জটিল কথা সহজ করে বলে ফেলি। ফুলফুলিয়া শোন, তুমি কিন্তু আমার কথা রাখ নি। তোমাকে বলেছিলাম আমি না বলা পর্যন্ত তুমি যেন জহিরের চিঠি না পড়। তুমি কিন্তু পড়ে ফেলেছ।

এটাও কি অনুমান করে বললেন?

হ্যাঁ।

আপনার অনুমান শক্তি ভালো। এখন বলুন তো চিঠিতে কী লেখা।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, দীর্ঘ চিঠিতে একটাই বাক্য গুটি গুটি করে লেখা— তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ভালোবাসি। জহির চিঠিতে এত অসংখ্যবার তোমাকে ভালোবাসি বলে ফেলেছে যে বাকি জীবনে সে যদি আর একবারও না বলে তোমার কোনো অসুবিধা হবার কথা না। ফুলফুলিয়া তুমি খুবই ভাগ্যবতী মেয়ে।

ফুলফুলিয়ার কঠিন চোখ কোমল হতে শুরু করেছে। চোখের দুপাশের ল্যাকরিমাল গ্র্যান্ড উদ্দীপ্ত হয়েছে। এখনই চোখে পানি জমতে শুরু করেছে। চোখের পানি বর্ণহীন। কিন্তু ভালোবাসার চোখের পানির বর্ণ ঈষৎ নীলাভ। ফুলফুলিয়া গাঢ় স্বরে বলল, হিমু ভাইজান আমাদের বিয়েতে আপনি থাকবেন না?

আমি তার প্রশ্নের জবাব দিলাম না। সব প্রশ্নের জবাব দিতে নেই।

ওসি সাহেব নিজেই আমাকে জেল হাজতে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার হাতে হাতকড়া নেই, কোমরে দড়ি নেই। আমি পুলিশের জিপের পেছনের সিটে বেশ আরাম করেই বসে আছি। ওসি সাহেব বসেছেন। আমার পাশে। তিনি একটার পর একটা সিগারেট টানছেন। জিপের ভেতরটা ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে। ওসি সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন–ওপরের দিকে যারা আছেন তাদের কাজকর্ম বোঝা খুবই মুসকিল। এখন প্রাণপণ চেষ্টা চলছে— যে প্যাচে আপনি পড়েছেন সেখান থেকে আপনাকে উদ্ধার করা। আপনার এক আত্মীয়, সম্ভবত সম্পর্কে আপনার খালু, তিনি হেন কোনো জায়গা নেই যেখানে ধরনা না দিচ্ছেন। কিন্তু একটা ব্যাপার। তিনি বুঝতে পারছেন না যে, প্যাচ থেকে আপনাকে উদ্ধার করা অসম্ভব কঠিন। আপনি এখন হত্যা মামলার আসামি। মৃত ব্যক্তি আপনাকে ফাঁসিয়ে ডেথ বেড কনফেসন দিয়ে গেছে।

আমাকে দড়িতে ঝুলতেই হবে?

ওসি সাহেব প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে কাশতে শুরু করলেন। আমি বললাম, ওসি সাহেব। আপনি এত আপসেট হবেন না। জগৎ খুব রহস্যময়। হয়তো এমন কিছু ঘটবে যে আমি হাসিমুখে জেল থেকে বের হয়ে আসব। জহিরের বিয়েতে আমার সাক্ষী হবার কথা। হয়তো দেখা যাবে যথাসময়ে আমি কাজি অফিসে উপস্থিত হয়েছি।

ওসি সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, এটা কীভাবে সম্ভব?

আমি বললাম, যে লোক আসলেই খুনটা করেছে। হয়তো দেখা যাবে সে অপরাধ স্বীকার করে পুলিশের হাতে ধরা দেবে, কিংবা পুলিশ বলবে উপরের নির্দেশে আমরা নিরপরাধ একটা লোককে ধরে এনে মামলা সাজিয়েছি। কী বলেন এ রকম কি ঘটতে পারে না?

ওসি সাহেব জবাব দিলেন না। আমি বললাম, ভাই আপনি কি আমার ছোট্ট একটা উপকার করবেন? জেল-হাজতে ঢুকবার আগে আমি একজনের সঙ্গে দেখা করে যেতে চাই।

কার সঙ্গে?

একটা গাছের সঙ্গে। মানুষ জেল হাজতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে।। গাছতো পারবে না। তার কাছ থেকে বিদায় নিতে হলে তার কাছেই যেতে হবে।

আমি রাধাচুড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি। গাছের রোগমুক্তি ঘটেছে। পত্রে পুষ্পে সে ঝলমল করছে। বিকেলের পড়ন্ত আলো পড়েছে। মনে হচ্ছে গাছের পাতায় আগুন ধরে গেছে। অপার্থিব কোনো আগুন। যে আগুনে উত্তাপ নেই— আলো আছে, আনন্দ আছে।

আমি গাছের গায়ে হাত রেখে বললাম, বৃক্ষ তুমি ভালো থেকো।

বৃক্ষ নরম কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল, হিমু তুমিও ভালো থেকো। ভালো থাকুক। তোমার বন্ধুরা। ভালো থাকুক সমগ্র মানব জাতি।

(সমাপ্ত)